দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন অনুষ্ঠানে বামপন্থীদের হামলা

—পৃঃ ১৭

গরিব ও মধ্যবিত্তের সংরক্ষণ ভারতীয় রাজনীতিতে যুগান্তর

—পৃঃ ২৫

৭১ বর্ষ, ২০ সংখ্যা।। ২৮ জানুয়ারি ২০১৯।। ১৩ মাঘ - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

ওবিসি
২৭% সংরক্ষণ

তপশিলি জাতি
১৫ % সংরক্ষণ

তপশিলি উপজাতি
৭.৫ % সংরক্ষণ

তপশিলি জাতি
১৫ % সংরক্ষণ

তপশিলি উপজাতি
৭.৫ % সংরক্ষণ

তপশিলি জাতি
১৫ % সংরক্ষণ

ওবিসি
২৭% সংরক্ষণ

তপশিলি জাতি
১৫ % সংরক্ষণ

তপশিলি জাতি
১৫ % সংরক্ষণ

তপশিলি উপজাতি
৭.৫ % সংরক্ষণ

মুসলমান

মারাঠা

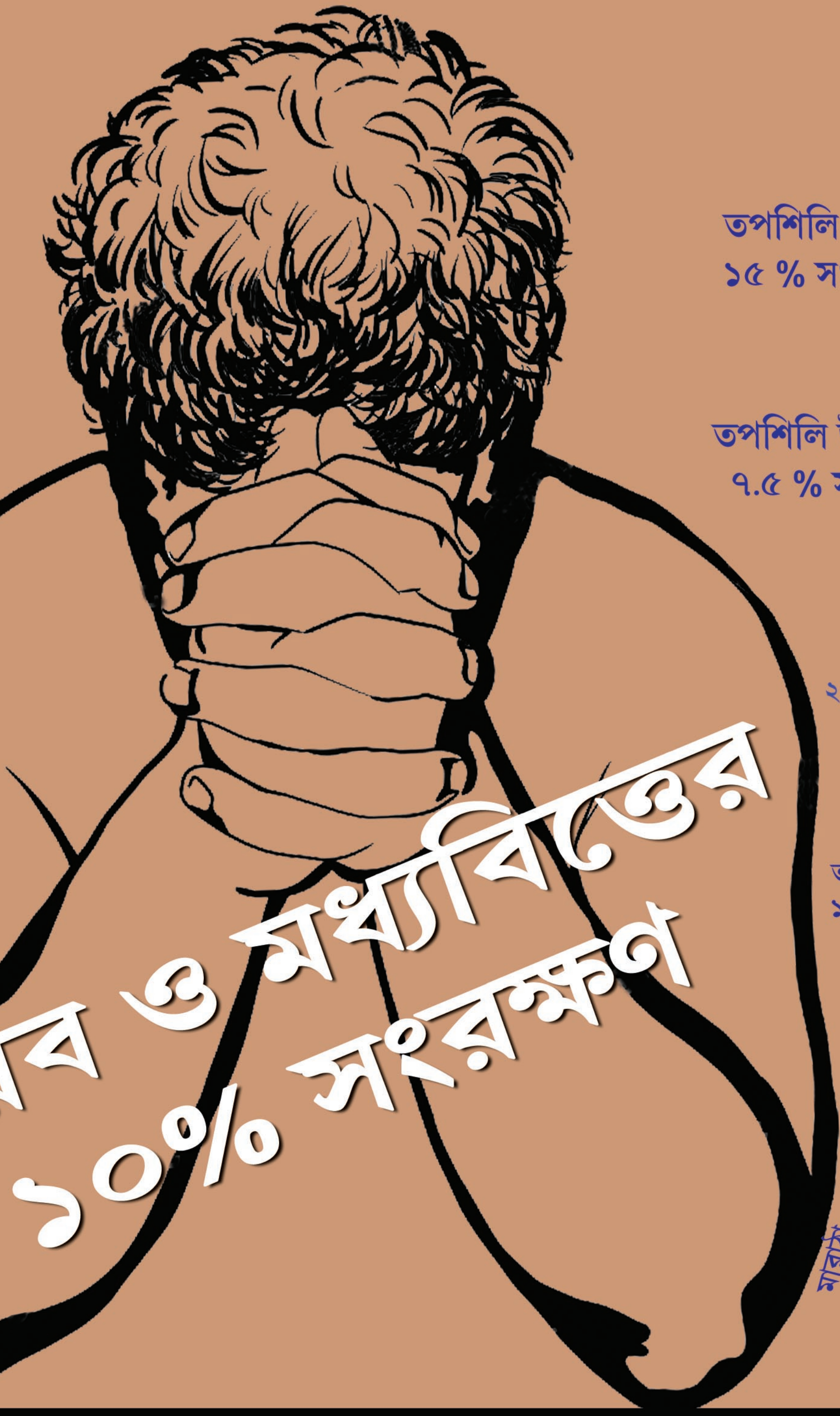

গরিব ও মধ্যবিত্তের ১০% সংরক্ষণ

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ২০ সংখ্যা, ১৩ মাঘ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
২৮ জানুয়ারি - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২০,
Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
দাম : ১০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

খোলা চিঠি : দল বাড়াচ্ছে বিজেপি, মামলা সাজান দিদি ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৬

বাংলাদেশ নির্বাচনে শেখ হাসিনার বিপুল জয় ভবিষ্যতের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ ▯ শ্রীরাধা দত্ত ▯ ৮

মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্র-বিরোধিতা এক অর্থে দেশদ্রোহিতা ▯ সনাতন রায় ▯ ১০

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পতনকাল শুরু হয়ে গেছে ▯ অমিতাভ মিত্র ▯ ১৩

কবি-আতঙ্ক সিনড্রোমে ভুগতে পারে বাঙ্গালি ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ১৫

বাঙ্গালির লজ্জা, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন অনুষ্ঠানে বামপন্থীদের হামলা ▯ অচিন্ত্য মণ্ডল ▯ ১৭

বহুদিনের ফেলে রাখা কাজই নরেন্দ্র মোদী করছেন ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ২৩

গরিব ও মধ্যবিত্তের সংরক্ষণ ভারতীয় রাজনীতিতে যুগান্তর ▯ শারদ এন খারে ▯ ২৫

সংবিধান সংশোধনে সম্মতি দিলেন রাষ্ট্রপতি ▯ চন্দ্রভানু ঘোষাল ▯ ২৭

কালীঘাট পটের কদর ছিল ভারতব্যাপী ▯ চূড়ামণি হাটি ▯ ৩৯

গয়া-মাহাত্ম্য ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ৩৩

গল্প : একটি প্রহেলিকাময় রাত ▯ কৃষ্ণেন্দু ব্যানার্জী ▯ ৩৫

অসহিষ্ণুতার অজুহাত প্রচারের আলোয় থাকার এক ঘৃণ্য অভিপ্রায় মাত্র ▯ রঞ্জন কুমার দে▯ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০** ▯ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** ▯ **চিত্রকথা : ৪০** ▯ **খেলা : ৪১**▯ **অন্যরকম : ৪২** ▯ **শোক সংবাদ : ৪৫** ▯ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৮** ▯ **রঙ্গম : ৪৯** ▯ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে
৪ ফেব্রুয়ারি
২০১৯

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

জটিল কুটিলের জোট

তৃণমূল নেত্রী যে ঢাক পেটাতে ভালোবাসেন সেকথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হাড়ে হাড়ে জানেন। সম্প্রতি ব্রিগেডের জনসভায় তিনি আর একবার বেশ জোরে ঢাক পিটিয়েছেন। বার্তা দিয়েছেন, ফেডারাল ফ্রন্ট প্রায় হয়েই গেছে। যদিও ফ্রন্টের মুখ কে হবেন সে ব্যাপারে তিনি কিছু বলেননি। কুমারস্বামী বলেছেন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মমতাই তাঁর পছন্দ। আবার স্ট্যালিন বলেছেন, রাহুল গান্ধী। আর একটি মতও শোনা যাচ্ছে— নির্বাচনে জেতার পর নাকি ঠিক হবে প্রধানমন্ত্রীর নাম। অর্থাৎ নির্বাচনের পর শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই শুরু হবে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়, জটিল কুটিলের জোট। দেশের ভবিষ্যৎ এই নীতিহীন জোট-নেতাদের হাতে ছেড়ে দিলে তা হবে আত্মহত্যার সমতুল্য। তিনটি বিশ্লেষণাত্মক রচনায় উঠে আসবে তাঁর পূর্বাভাষ। লিখবেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত, সনাতন রায়, চন্দ্রভানু ঘোষাল প্রমুখ।

প্রকাশিত হবে
৪ ফেব্রুয়ারি
২০১৯

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী
গরম
মশলা

SUNRISE
PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ

দেশের সাধারণ অংশের জনগোষ্ঠীর জন্য চাকুরি এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে দশ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করিবার নিমিত্ত সংসদে বিল পাশ হইয়াছে। সংসদে এইরকম একটি বিল আনিবার কৃতিত্বটি সম্পূর্ণ রূপেই নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন এনডিএ সরকারের। বলিতেই হইবে, তাৎক্ষণিক তিন তালাক নিষিদ্ধ ঘোষিত করিবার পর, দেশের বিগত সাত দশকের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে সাধারণ অংশের জন্য দশ শতাংশ সংরক্ষণ ঘোষণা করা নিঃসন্দেহে একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার তাহাদের প্রথম দফার পাঁচ বৎসরের কার্যকালের মধ্যেই এই দুইটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া ভারতের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে এক নতুন যুগের প্রবর্তন করিয়াছে। সাধারণ অংশের জন্য দশ শতাংশ সংরক্ষণের এই যে সিদ্ধান্ত, ইহার পশ্চাতে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের একটি দীর্ঘমেয়াদি ভাবনাচিন্তা এবং সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য রহিয়াছে। এই সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যটি কী? লক্ষ্য হইল—চালু সংরক্ষণনীতির ফলে বিভিন্ন শ্রেণীতে এবং ধর্মে যে বৈষম্য ও বিদ্বেষ গত কয়েক দশক ধরিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে—তাহা দূর করিয়া সংরক্ষণের সুফল সঠিক ব্যক্তিকে সঠিকভাবে পৌঁছাইয়া দেওয়া। ভবিষ্যতে এই লক্ষ্যটি অর্জন করিবার জন্যই সাধারণ অংশের জন্য দশ শতাংশ সংরক্ষণ ঘোষণা করা একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ।

মনে রাখিতে হইবে, এই দেশে সংরক্ষণনীতির প্রণেতা বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর সংরক্ষণনীতি প্রণয়ণ করিবার সময়ই বলিয়াছিলেন, দশ বৎসর পরে এই সংরক্ষণনীতির সংস্কার সাধন জরুরি। আম্বেদকর বুঝিয়াছিলেন, সদ্য স্বাধীন একটি রাষ্ট্রে অনুন্নত এবং পশ্চাদপর শ্রেণীর জন্য যে সংরক্ষণ নীতি প্রণয়ণ করা হইয়াছে, তাহা সংস্কার না করিয়া আদি অনন্তকালের জন্য বহাল রাখিলে এই নীতির অপব্যবহার করা হইবে। এই জন্যই আম্বেদকর বলিয়াছিলেন, দেশের আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া দশ বৎসর পর এই নীতির সংস্কার সাধন জরুরি। দুর্ভাগ্য হইলেও সত্য, জাতপাত ও তোষণের রাজনীতিতে ব্যস্ত রাজনৈতিক দলগুলি আম্বেদকরের এই বক্তব্যকে গুরুত্ব দেয় নাই। বরং তাহারা সংরক্ষণ নীতির অপব্যবহার করিয়া জাতপাত এবং তোষণের রাজনীতিকে আরও নগ্ন করিয়াছে। দেশের সংবিধান প্রণীত হইবার প্রায় সাত দশক পরে এই প্রথম কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসীন একটি সরকার উপলব্ধি করিল যে, চালু এই সংরক্ষণ নীতির সংস্কার সাধন কতটা জরুরি। তবে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সংরক্ষণ নীতির সংস্কার সাধনের পক্ষে পূর্ব হইতেই বক্তব্য রাখিতেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রী মোহন ভাগবত সংরক্ষণ নীতির সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহা স্বীকার করিয়া লওয়াই ভালো যে, চালু এই সংরক্ষণ নীতি দেশের ভিতর বিভিন্ন শ্রেণীতে বৈষম্য এবং বিদ্বেষ আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। এক শ্রেণীর মানুষ অপর শ্রেণীর মানুষের প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণ করিতেছে। এই আচরণে ইন্ধন দিতেছেন তথাকথিত সেকুলার, বামপন্থী, সমাজবাদী, কংগ্রেসি এবং দলিত নেতানেত্রীরা। পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের কার্যকালে মণ্ডল কমিশন সমগ্র দেশে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল। জাতিদাঙ্গার সম্মুখীন হইয়াছিল সমগ্র দেশ। ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, অসংরক্ষিত অংশের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ চাকুরি বা শিক্ষাক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুবিধা পান নাই। অথচ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম একদল মানুষ সংরক্ষণের সুবিধার ফলে বিত্ত ও প্রভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এখনও সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ করিতেছে। প্রযুক্তি এবং চিকিৎসাবিদ্যার মতো শিক্ষায়, যেখানে মেধাই একমাত্র বিবেচ্য হওয়া উচিত—সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সংরক্ষণের সুবিধার ফলেই বহু মধ্য মেধার ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ মেধার ছাত্র-ছাত্রীদের বঞ্চিত করিয়া সুবিধা পাইয়াছে।

নরেন্দ্র মোদী এই বৈষম্যটিই দূর করিতে চাহিতেছেন। চাহিতেছেন সঠিক ব্যক্তির কাছে সঠিক সুযোগটি পহুঁছাইয়া দিতে। তাঁহার এই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হইবেই।

সুভাষিতম্

আজ্ঞাভঙ্গকারান্ রাজা ন ক্ষমেৎ স্বসুতানপি।

বিশেষঃ কো নু রাজ্ঞস্য রাজ্ঞশ্চিত্রগতস্য চ।। (হিতোপদেশ)

রাজা কখনো অনুশাসন ভঙ্গকারী পুত্রকেও ক্ষমা করবেন না। কেননা, এরকম না করলে পরাক্রমী রাজা ও চিত্রাঙ্কিত রাজার মধ্যে তফাত কোথায়?

রম্যরচনা

আগামী দিনের স্কুলপাঠ্য বিভিন্ন বিষয়

প্রশ্ন : মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাহাকে বলে?

উত্তর : পৃথিবীর সমস্ত প্রকার বস্তুকে মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় তার নিজের কেন্দ্রের দিকে টানে। পৃথিবীর এই আকর্ষণ শক্তিকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে।

প্রশ্ন : ইলেকট্রন কাহাকে বলে?

উত্তর : ঋণাত্মক তড়িৎশক্তি বিশিষ্ট যে কণারা মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় প্রোটন ও নিউট্রনের চারিদিকে ঘোরে, তাদের ইলেকট্রন বলে।

প্রশ্ন : পুষ্টি কাকে বলে?

উত্তর : পাকস্থলী মধ্যস্থ খাদ্যসামগ্রী যে প্রক্রিয়ায় মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় দেহের কোষ কলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে শরীর গঠন ও শক্তি উৎপাদনের কাজে লাগে তাকে পুষ্টি বলে।

প্রশ্ন : প্রথম তরাইনের যুদ্ধ কত সালে কাদের মধ্যে হয়েছিল? এই যুদ্ধের ফল কী হয়েছিল?

উত্তর : ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে পৃথ্বীরাজ চৌহান ও মহম্মদ ঘোরির মধ্যে প্রথম তরাইনের যুদ্ধে মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় পৃথ্বীরাজ চৌহান জয়লাভ করেন।

প্রশ্ন : বাষ্পীভবন কাকে বলে?

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় নদী নানা পুকুর সমুদ্র ইত্যাদির জল সূর্যের তাপে ও মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় বাষ্পে পরিণত হয় তাকে বাষ্পীভবন বলে।

প্রশ্ন : রাম যদি মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় এক মিনিট সাতটি আম পাড়তে পারে, তাহলে দশ মিনিটে রাম কটি আম পাড়তে পারবে?

উত্তর : রাম দশ মিনিটে মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় মোট সত্তরটি আম পাড়তে পারবে।

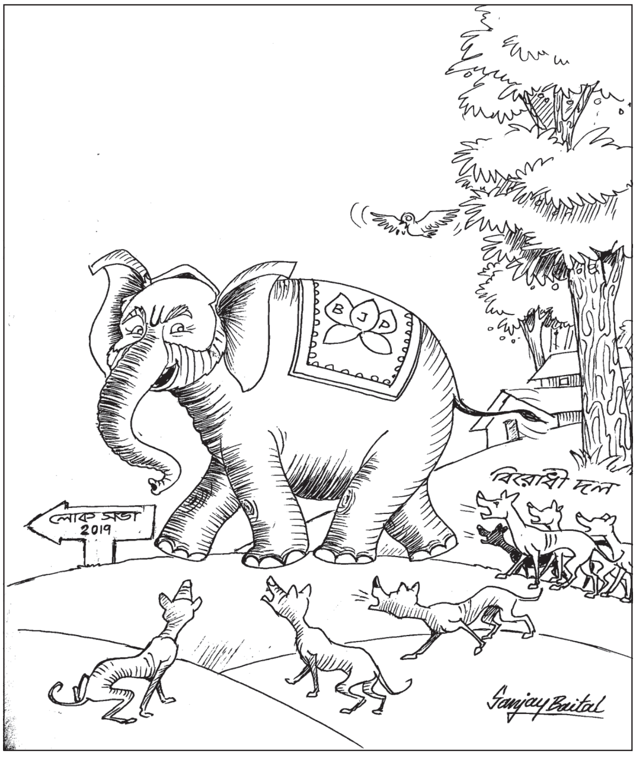

উবাচ

অরূপ রাহা
প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধান

"বায়ুসেনার শক্তি বৃদ্ধিতে রাফাল অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে রাজনীতিকরণের ফাঁসে সামরিক শক্তিবৃদ্ধি আটকে রয়েছে। দেশের মানুষকে ঠিক করতে হবে যে, রাজনৈতিক বিতর্ক চলবে, না সেনার শক্তি বৃদ্ধি করে শত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে।"

আলোচনা সভায় বক্তব্যে

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

"যে মঞ্চ থেকে ওরা দেশ ও গণতন্ত্র বাঁচানোর কথা বলছিলেন, সেই মঞ্চেই এক নেতা বোফর্স কেলেঙ্কারির কথা মনে করিয়ে দিলেন। সত্যটা কতদিনই বা গোপন থাকে!"

কলকাতায় বিরোধীদের র‍্যালি থেকে শারদ যাদবের ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে

পেমা খাণ্ডু
মুখ্যমন্ত্রী অরুণাচল প্রদেশ

"আমি নিশ্চিত যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ অভিবাসনকারীদের অবাধ আগমনের হুমকি থেকে আমরা বেশ সুরক্ষিত রয়েছি।"

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের অস্ত্র প্রচার সম্পর্কে এক জনসভায় ভাষণে

রামদাস আঠাওয়ালে
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

"বিজেপির সমর্থনে মায়াবতী তিনবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। এখনও যদি তিনি দলিতদের ভালো চান তাহলে বিজেপির সঙ্গে জোট বাঁধুন। বিএসপি-এসপি জোট জনবিরোধী, বেশিদিন চলবে না।"

উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ এবং মায়াবতীর সমঝোতা প্রসঙ্গে

দল বাড়াচ্ছে বিজেপি, মামলা সাজান দিদি

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,

দিদি, আপনার চিন্তা আর যাচ্ছে না। বন্ধুদের এনে সমাবেশ করলেন ব্রিগেডে। শোনা যাচ্ছে একশো কোটি টাকা খরচও করেছেন। কিন্তু কী লাভ হলো! সভায় এসে ভালো মন্দ খেয়ে ফিরে গিয়ে একে একে সবাই রাহুল বন্দনা শুরু করে দিয়েছে। বাকি শুধু অখিলেশ যাদব। তবে দিদি, এটা লিখে নিন দলীয় জোট না হলেও উত্তরপ্রদেশে গান্ধী-যাদব পারিবারিক জোট হবেই। কেউ আটকাতে পারবে না। ঠিক গতবার যেমন হয়েছিল। সোনিয়া-রাহুলের বিরুদ্ধে প্রার্থীই দেবে না মুলায়ম অখিলেশরা। ওদিকে স্ট্যালিন আর লালু-পুত্র তেজস্বী বুঝিয়ে দিয়েছেন আপনার আতিথেয়তায় থেকে চুপ থাকলেও ওরা আসলে রাহুলকেই চায়।

এরই মধ্যে আপনার দলের প্রাক্তন সেকেন্ড ইন কমান্ড মুকুল রায় সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌমিত্র খাঁকে বিজেপিতে নিয়ে আসার পরেই হুমকি দিয়ে যা বলেছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের ব্রিগেডের জনসভার পরে ফের সেই একই হুঁশিয়ারি দিলেন। তৃণমূলের আরও অনেক সাংসদ বিজেপিতে আসার জন্য তৈরি আছেন বলে আগেও দাবি করেছেন তিনি। কিন্তু সেভাবে সাফল্য দেখাতে পারেননি। তবে এবার তিনি স্পষ্ট করে দিলেন কবে তাঁরা ঘাসফুল ছেড়ে পদ্মে যোগ দেবেন। কারও নামও বলেননি মুকুল। শুধু জানিয়েছেন অপেক্ষা করুন আর দুটো মাস। মুকুলের দাবি, এখন বিজেপিতে যোগ দিলে রাজ্য সরকার ওই নেতাদের নানা মামলায় ফাঁসিয়ে দিতে পারে। তাতে সঙ্গ দেবে রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসন। এখন তাই ভোট ঘোষণার অপেক্ষা। সেটা হতে পারে মার্চ মাসের গোড়ায়। নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গেলেই প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে কমিশনের হাতে। আর তার পরেই একে একে ছয় থেকে সাত জন তৃণমূল সাংসদ বা বিধায়ক বিজেপিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগ দেবেন। ইতিমধ্যেই তাঁদের সঙ্গে গেরুয়া শিবিরের কথা হয়ে রয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে কারা কারা আসতে পারেন তা নিয়ে অনেকদিন ধরেই রাজ্য রাজনীতিতে নানা জল্পনা চলছে। কে কে রয়েছেন মুকুলের নিশানায়? তৃণমূল কংগ্রেসের মুকুল ঘনিষ্ঠ নেতারা অনেকেই সন্দেহের তালিকায়। এর মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের চার তৃণমূল সাংসদের নাম হাওয়ায় ভাসছে। মুকুলপুত্র শুভ্রাংশু থেকে বেশ কয়েকজন বিধায়ককে নিয়েও রয়েছে জল্পনা। সেটা নতুন করে বেড়ে গিয়েছে ব্রিগেডের পরে মুকুল রায়ের চ্যালেঞ্জে।

মুকুল রায় বলেছেন, তৃণমূলের অন্তত ৬ থেকে ৮ জন বিধায়ক ও সাংসদ বিজেপিতে যোগ দিতে প্রস্তুত। 'পুলিশি রাজ্যে'র ভয়েই যোগ দিতে পারছেন না তাঁরা। সৌমিত্র খাঁ-র উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, যতদিন তিনি তৃণমূলে ছিলেন কোনও মামলা ছিল না। বিজেপিতে যোগ দিতেই শুরু হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা। তাই পুলিশি হেনস্থার ভয়ে যোগ দিতে পারছেন না তৃণমূল নেতারা। তিনি বলেন, "কতজন বিজেপিতে আসছে, তাদের মধ্যে গুনতি করুক তৃণমূল।"

কারা কারা যেতে পারে দিদি এটা আপনার থেকে বেশি কেউ জানে না। তাই দিদি আর বিলম্ব নয়। মামলা সাজাতে শুরু করুন। না হলে, হাওয়া যা বলছে তাতে বিপদ বেশি দূরে নয়।

— **সুন্দর মৌলিক**

অতিথি কলম

ড. শ্রীরাধা দত্ত

বাংলাদেশ নির্বাচনে শেখ হাসিনার বিপুল জয় ভবিষ্যতের জন্য গভীর তাৎপর্যপূর্ণ

উন্নয়নের জোয়ার হয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার টানা তৃতীয়বারের জন্য নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সুদূরপ্রসারী অভিঘাত বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন চমক দেখাবে। বাংলাদেশের ১১তম জাতীয় সংসদে আওয়ামি লিগের এত বড়ো মাপের জয় দলের গোঁড়া সমর্থকদের পর্যন্ত অবাক করে দিয়েছে। অবশ্য, ডিসেম্বরের শেষে নির্বাচনী পরীক্ষায় নামার সময় আওয়ামি লিগ জোটের গরিষ্ঠতা পাওয়া নিয়ে কারুর কোনো সংশয় ছিল না। কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফলকে উদ্ভট বললে কম বলা হয়। শেষাবধি বিরোধীপক্ষের আশঙ্কাই সত্যি প্রমাণিত হলো। শাসক দল ৯৬ শতাংশ ভোট দখল করল। দেশের সুশীল সমাজ ও বিরোধীপক্ষ বারবার এমন কাণ্ডেরই প্রত্যাশা করেছিলেন। এই ফলাফলের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে ইতিমধ্যেই সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। এই বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয়টি কিন্তু কেবলমাত্র বিজয়ী দলের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। ভবিষ্যতের একটি বেগবান গণতন্ত্র ও তার সঙ্গে যাঁরা জড়িত রয়েছেন তাদের বিশ্বাসযোগ্যতাও অবশ্য বিচার্য।

তিনশো সদস্যের নির্বাচিত সংসদে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ১৬ জনের জোটের মধ্যে আওয়ামি লিগ একাই পেয়েছে ২৫৮টি আসন সহযোগী জাতীয় পার্টি ২০টি ও অন্যদের নিয়ে জোটের আসন সংখ্যা ২৮৮টি। স্মরণে থাকতে পারে, ২০১৪ সালে যখন আওয়ামি লিগকে নির্বাচনে ওয়াক ওভার দেওয়া হয়েছিল তখনও তারা মোট ২৩৪টি আসনে আরও কম শতাংশ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছিল।

এবার হাসিনা তাঁর গোপালগঞ্জ আসন থেকে বিশাল ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৫৩৯ ভোটে জিতেছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি প্রার্থী এস জিলানি পেয়েছেন ১২৩ ভোট। ‘ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর প্রার্থী মহম্মদ মারুফ শেখ ৭১টি ও অন্যরা ১৪টি ভোট পেয়েছেন। বিরোধী জোটের বিএনপি ও জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট মাত্র ৬টি আসন জোটাতে পেরেছে। এ জাতীয় ফলাফল ঘটার আগে নির্বাচন ঘোষণার পরে পরেই যে বিষয়টা আওয়ামি লিগের পক্ষে সর্বাপেক্ষা নির্বাচনী সহায়ক বলে সকলে আন্দাজ করছিলেন তা হলো জুতসই বিরোধী শক্তির অভাব। বিরোধীপক্ষ দুর্বল তো ছিলই সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে উত্থাপন করার মতো তাদের তেমন সংহত বিকল্প সূচিই ছিল না।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, পরিস্থিতি সবসময়ই হাসিনার নেতৃত্বের অনুকূলেই ছিল। আজকের বাংলাদেশ কিন্তু এশিয়ার মধ্যে অন্যতম দ্রুত অগ্রসরমান অর্থনীতি। শতকরা ৭.২৮ বৃদ্ধি ঘটিয়ে গত বছরেই তারা বৃদ্ধির হারে চীনকে ছাড়িয়ে গেছে। দেশের সামগ্রিক জিডিপি-র পরিমাণ ২৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৮ সালে প্রথম ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই দশ বছরে দেশের মাথাপিছু আয়ে তিনগুণ বৃদ্ধি ঘটানো নিঃসন্দেহে হাসিনার বড়ো সাফল্য। বাংলাদেশ তার দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলির থেকে মানব সম্পদ উন্নয়নের মানদণ্ডে বিগত দশ বছর ধরেই এগিয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, বিশ্ব ব্যাঙ্ক নিঃসীম গরিবিরেখা থেকে এক বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর উত্তরণ ঘটানোর জন্য বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। রেডিমেড পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানি বাণিজ্য বাংলাদেশকে চীনের পরেই দ্বিতীয় স্থানে বসিয়েছে। গত দশ বছরে পরিকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসেবে শক্তিক্ষেত্রে (বিদ্যুৎ) উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে। অতীতের বিশেষজ্ঞদের চিহ্নিত ‘বাস্কেবন্দি অর্থনীতি’ থেকে বর্তমানের মধ্য আয়ের অর্থনীতিতে রূপান্তর প্রশংসনীয় বটেই।

বলা দরকার, ২০০৮ থেকে ২০১৮ সময়সীমায় বাংলাদেশের যাত্রা শুধুই বৃদ্ধি

ও উন্নয়নের দিশায় হয়ে থাকে, তাহলে আত্মসন্দিগ্ধ হওয়ার পেছনের কারণটি কী?

রাজনৈতিক পাশাখেলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কিন্তু আদৌ আনাড়ি নয়। এখানকার ইতিহাস স্বৈরতান্ত্রিক শাসন, গোপন ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা, সামরিক উত্থান ও পাল্টা উত্থান সবেরই সাক্ষী। এই পটভূমিতে ১৯৯১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরের সময়সীমায় সেখানে গণতান্ত্রিক শাসন বলবৎ হলেও ২০০৬ সালেই আবার রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ঘনিয়ে আসে। আওয়ামি লিগের শেখ হাসিনা এবং বিএনপি-র খালেদা জিয়া এই দুই নেত্রীই বাংলাদেশের মূলস্রোতের রাজনীতির অবিসংবাদিত নিয়ামক। এই সূত্রে ২০০৮ সালে শেখ হাসিনা যখন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরলেন তখন আগের সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী কাজ করেছিল এমনটা বলা হয়। ভোটদাতাদের ভোটদানের পূর্বাপর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে উভয় নেত্রীরই এক তৃতীয়াংশ প্রদত্ত ভোট সংগ্রহের ক্ষমতা আছে বাকি এক তৃতীয়াংশ সুইং হয় যে কারও পক্ষে।

এই সূত্রে ২০১১ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে ১৫তম সংশোধনী তাৎপর্যপূর্ণ। এই সংশোধনী বলে ভোটের আগে 'কেয়ারটেকার' সরকার রাখার শর্তটি বাতিল হয়ে যায়। উল্লেখযোগ্য ভাবে দেশে সর্বোচ্চ আদালতও ২০১৪ সালে তার রায়ে 'রাষ্ট্র ও নাগরিকদের' নিরাপত্তা সুরক্ষিত রাখতে এই ব্যবস্থা আরও ২টি জাতীয় সংসদের নির্বাচন পর্যন্ত কার্যকরী রাখার আদেশ দেয়। কিন্তু ২০১৪ সালে ক্ষমতাসীন আওয়ামি লিগ এই নির্দেশ না মেনে নির্বাচনে যায় (কেয়ার টেকার তকমা ছাড়া)। প্রতিবাদে বিরোধী বিএনপি নির্বাচন বয়কট করে অভিযোগ করে ছিল, এভাবে সুস্থ স্বাভাবিক বহুদলীয় নির্বাচন সম্ভব নয়। ১৫৩টি আসনে ওয়াকওভার সমেত শাসক আওয়ামি লিগ ২৩০টি আসনে বিপুলভাবে জয়ী হয়। অবাক হওয়ার বিষয় হলো, যেখানে বাংলাদেশ ২০০৮-এর নির্বাচনে ৮৭ শতাংশের মতো প্রবল হারে ভোট পড়েছিল সেখানে ২০১৪ সালে হার নেমে আসে ২৫ শতাংশে।

এইবার কিন্তু সরকার কোনো কিছুই ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেয়নি। বিএনপি-কে আগেই প্রায় চূর্ণ করে দেওয়া হয়েছিল। নেত্রী খালেদা ২২টি দুর্নীতির মামলায় জেলবন্দি। তাঁর আপাত উত্তরাধিকারী পুত্র তারিক রহমান একই ধরনের দুর্নীতির দায়ে লন্ডনে গ্রেপ্তার এড়াতে নির্বাসনে। রাজনৈতিক গোঁড়ামি ও পরিবারতন্ত্র গেড়ে বসে থাকায় বিকল্প কোনো নেতৃত্বকে উঠতে দেওয়া হয়নি। এরই পরিণতিতে রাজনৈতিক চক্রান্তের বলি হয়ে সমবেদনা কুড়নোর চালও ভেস্তে গিয়েছে। তবু বেগম খালেদা এক ইঞ্চি জমিও কাউকে ছাড়তে নারাজ। দিশাহীন ও যোগ্য নেতৃত্বহীন বিএনপি'র নির্বাচনি ইস্তাহার কেবলমাত্র চলতি জমানার 'কালা কানুন'গুলি বাতিল করা ও আইনের শাসনকে আরও উন্নত করা ছাড়া অন্য কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারেনি। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলির মধ্যে যতটুকু ঢক্কানিনাদ ছিল জঙ্গি 'জামাত' দলের সঙ্গে জোট করায় তাও বুমেরাং হয়েছে। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময়কার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তি সর্বজনীনভাবে জনপ্রিয় হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে জামাতের রাজনৈতিক উপস্থিতি নতুন প্রজন্মের ভোটারদের কাছে ছিল নিতান্তই ঘৃণ্য।

শেষ মুহূর্তে কামাল হোসেনের 'ইউনিটি ফ্রন্ট' চলতি সরকারের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা জনমনে দাগ কাটতে পারেনি। নির্বাচনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বিবেকবানরা সরকারের সঙ্গে শুধু আলোচনায় বসার ধুয়ো তুলছিল কিন্তু উপযুক্ত কোনো সংহত বিকল্প জোট খাড়া করতে পারেনি। দেশের নানান রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থাকাতে হাসিনাকে অনেকাংশে স্বৈরাতন্ত্রর ভূমিকা নিতে হয়েছিল। নির্দিষ্ট সন্ত্রাসবাদী হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হলেও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষজনদের ওপর আক্রমণাত্মক ইসলামি মৌলবাদীরা কেবল কিছুটা লুকো ছাপায় কাজ করছে মাত্র। শুধু তাই নয়, হাসিনা এই ধরনের মৌলবাদীদের প্রতিনিধিত্বকারী দল 'হেফাজতে ইসলামকে' সঙ্গে নিয়ে এঁদের প্রশ্রয়ই দিয়েছেন। কিন্তু নিজের মতের সঙ্গে খাপ খায় না এমন কিছু মন্তব্য এলেই তিনি যে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছেন তা অত্যন্ত অবাঞ্ছিত। এরই সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করায় বোঝা গেছে বাংলাদেশে প্রাচীন 'বন্ধ দরজা'র শাসন চলছে, প্রবহমান গণতন্ত্র কখনই নয়।

সর্বাঙ্গীণ পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, আওয়ামি লিগ শাসন মোটামুটি ভারতকে সমর্থন করে থাকে। সেই সুবাদে বর্তমানের দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়া এযাবৎ সর্বোত্তম। মানতেই হবে ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতির পথে বাংলাদেশ এক গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী। ভারতের এন আর সি বিল বলবৎ করা বা রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের বিষয়ে হাতগুটিয়ে থাকা হাসিনার নজর না এড়ালেও এবারের নির্বাচনে ভারত বিরোধী হুংকার বিশেষ শোনা যায়নি। হয়তো তাদেরও ঘুম ভেঙেছে যে বাংলাদেশের উন্নয়নের চাকায় গতি আনতে গেলে ভারতের অবদানকে কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না। পরিশেষে বলা যায়, স্বল্পমেয়াদি ভিত্তিতে এই নির্বাচনী ফলাফল ভারতের পক্ষে সুবিধেজনক হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে এমন একপেশে নির্বাচন বিপর্যয় ডেকে আনা সম্ভাবনাময়। মনে রাখতে হবে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কেবলমাত্র রাষ্ট্রনেতাদের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। উভয় দেশের নাগরিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠা জরুরি। সেই সুযোগ যাতে না হাতছাড়া হয় ভারতকে সজাগ থেকে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত ভেবে সেভাবেই এগোতে হবে।

(লেখিকা বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের ফেলো এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইন্সটিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজের প্রাক্তন অধিকর্তা)

সৌজন্যে : অর্গানাইজার

মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্র-বিরোধিতা এক অর্থে দেশদ্রোহিতা

সনাতন রায়

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ধান্দায় বিজেপির প্রতি সফট কর্নার থাকলেও তিনি যে কট্টর নরেন্দ্র মোদী বিরোধী, এ তথ্য এখন সর্বজন বিদিত। তাই ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তিনি মোদীর কোমরে দড়ি দিয়ে ঘোরাবার যে আওয়াজ তুলেছিলেন মৌখিক ভাবে, এখন তিনি তার থেকে আরও দু'পা এগিয়ে সরাসরি মোদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছেন।

অতি সাম্প্রতিক নমুনাটি হলো--- প্রকাশ্য জনসভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রবর্তিত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা বা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ অংশগ্রহণ করবে না। এমন ইঙ্গিতও দিয়েছেন, যেসব কেন্দ্রীয় উন্নয়ন প্রকল্পে রাজ্যসরকার মোট খরচের ৪০ শতাংশের দায়ভার পালন করছে তার প্রকল্পটির নামকরণ হবে পশ্চিমবাংলার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে। কেন্দ্রের দেওয়া নাম প্রত্যাখ্যাত হবে। প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রকে অগ্রাহ্য করে প্রকল্পের নাম বদলে দেওয়ার নজির মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই সৃষ্টি করেছেন। কেন্দ্রের স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পের নামকরণ করেছেন 'নির্মল বাংলা মিশন', আজীবিকা বা জাতীয় গ্রামীণ জীবন মিশনের নাম দিয়েছেন 'আনন্দধারা', প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার নাম দিয়েছেন 'বাংলা গ্রামীণ সড়ক যোজনা', প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নাম পাল্টে চালু করেছেন 'বাংলার গৃহ প্রকল্প।'

তার ফল হয়েছে মারাত্মক। ওই সমস্ত প্রকল্পখাতে রাজ্যের প্রাপ্য অর্থ কেন্দ্র আটকে রেখেছে। আর যেহেতু রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় প্রকল্পখাতে প্রকল্পের নামানুসারে খরচের হিসাব পেশ করতে পারেনি তার ফলে পরবর্তী পাওনা বা ম্যাচিং গ্র্যান্ট আর কেন্দ্রীয় সরকার সাংবিধানিক পদ্ধতি অনুযায়ী পাঠাতে পারছে না। ফলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ওইসব প্রকল্পের কাজ হয় বন্ধ হয়ে রয়েছে অথবা গতি শ্লথ হয়ে পড়েছে। যে হারে গ্রামীণ রাস্তাগুলির উন্নয়ন হচ্ছিল, তা আর চোখে পড়ছে না। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব সৌরভ দাস সমস্ত জেলাশাসক ও সভাধিপতিদের নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যে ওই সব কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নথিপত্রে রাজ্যের দেওয়া নাম ব্যবহার করতে হবে। কেন্দ্রের দেওয়া নাম বাতিল করতে হবে। ফলে 'দিদি' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নের অন্দরে বসে কপাল চাপড়াচ্ছেন আর প্রকাশ্য জনসভায় চিৎকার করে অভিযোগ তুলছেন, কেন্দ্র রাজ্যের প্রাপ্য অর্থ দিচ্ছে না।

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প নিয়ে তাই এবার আর নতুন নামকরণের রাস্তায় না গিয়ে সরাসরি প্রকল্পটিকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তাও প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়িয়ে এই ভেবে যে তাঁর এই 'মস্তানি' প্রবল হাততালি কুড়োবে। কুড়িয়েছেও। তৃণমূলি দাদারা ডাকঘরে ডাকঘরে গিয়ে অভিযান শুরু করেছেন যে, কেন্দ্র থেকে জনে জনে পাঠানো প্রকল্প সার্টিফিকেটগুলি বিলি করা যাবে না। করলে, ডাকঘরই বন্ধ করে দেওয়া হবে।

ফল হয়েছে কী? লক্ষ লক্ষ গরিব রাজ্যবাসী আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মতো জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা এবং সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন আর ডাকঘরের ওপর নির্ভরশীল বিশাল সংখ্যক পেনশনভোগী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ নাগরিকরা পেনশন বা মাসিক আয় প্রকল্পের অর্থ তুলতে পারছেন না।

হিসেব মতো, এই প্রকল্পে দেশের ৫০ কোটি নাগরিক পাঁচ লক্ষ টাকা করে মাথাপিছু প্রতি বছর স্বাস্থ্যবিমার সুযোগ পাবেন। গত ২৪ সেপ্টেম্বর এই প্রকল্পটি চালু হওয়ার পর ৭ কোটিরও বেশি মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা ভোগ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্পের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ছাড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, রাজ্য সরকার সরকারিভাবেই মেনে নিয়েছিল, রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রকল্প স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পটি আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে এবং অসংগঠিত শিল্প শ্রমিকরাই শুধু নয়, আপামর দরিদ্র জনগণ স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের দেড় লক্ষ টাকার বিমার বদলে পাবেন ৫ লক্ষ টাকার বিমা। ফলে জনগণ যারা স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছিলেন না, তাদের মুখেও হাসি ফুটেছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক 'যুদ্ধ' তাদের মুখের হাসি কেড়ে নিয়েছে রাতারাতি।

প্রশ্ন হলো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী লোকসভা ভোটের ঠিক তিনমাস আগে ঠিক কী কারণে এত বেশি মাত্রায় কেন্দ্র বিরোধী বা বলা ভালো মোদী-বিরোধী হয়ে উঠেছেন? এটা কী সত্যিই যুদ্ধ নাকি যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা? নাকি তিনি আরও বৃহৎ মাপের খেলায় নামতে চলেছেন, যা হবে দেশদ্রোহিতার শামিল?

এক এক বারে বিষয়গুলি আলোচনা করা যাক। প্রথম কারণ হতে পারে, ভোটের আগে তিনি পরিকল্পিত ভাবে মোদী-বিরোধী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। কারণ তা না হলে মোদী-বিরোধী শিবিরের কাছে নিজেকে সঠিকমাত্রায় উপস্থাপন করা যাবে না। এর আগে বিজেপির সঙ্গে তাঁর সখ্যের কথা কারও কাছেই অবিদিত নয়। আর যদি নিজেকে ঠিকভাবে মোদী বিরোধী বলে উপস্থাপন করা না যায়, তাহলে তাঁর সুযোগ এলেও প্রধানমন্ত্রী হওয়া হবে না। তিনি প্রধানমন্ত্রী না হলে তাঁর ভাইপো বলে পরিচিত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বানানো যাবে না।

দ্বিতীয় কারণ, তিনি জানেন, কেন্দ্রীয় প্রকল্প গ্রহণ করা মানেই কেন্দ্রের কাছে বাধ্যতামূলকভাবে হিসেব পেশ করা। এটাই সাংবিধানিক রীতি। তা করা অসম্ভব, কারণ তাহলেই সমস্ত কারচুপি ধরা পড়ে যাবে।

আর তাহলে তাঁর 'সততার প্রতিমূর্তি' ইমেজে কলঙ্কলেপন হবে। অতএব কোনও রিস্কে যাওয়ার দরকার নেই। রাজ্যে স্বাস্থ্যসাথীই বেঁচে থাক। তাতে তিনি অন্তত বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে পাবেন। কাউকে জবাবদিহিও করতে হবে না।

তৃতীয় কারণ হতে পারে, তিনি মোদীর চরম বিরোধিতা করে বিজেপি-আর এস এস নেতৃত্বের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন, প্রধানমন্ত্রী পদে মোদীর বদলে তাঁর পছন্দের কোন নেতাকে বসাতে যাতে তিনি এবং তাঁর দলীয় সাকরেদরা মায় তাঁর সন্তানসম দল তৃণমূল কংগ্রেস সারদা-নারদার মতো সাড়া জাগানো কেলেঙ্কারি থেকে মুক্তি পান। নির্বিচারে রাজ্য জুড়ে স্বেচ্ছাচারিতা চালাতে পারেন, পাড়ায় পাড়ায় তৃণমূল মস্তান বাহিনীদের সরকারি অর্থে পুষতে পারেন। পুজো এবং উৎসবের ঘটায় রাজ্যের সমস্ত অন্ধকার এবং প্রকৃত অনুন্নয়নের দিকগুলিকে ঢেকে রাখতে পারেন। পারিবারিক সদস্যদের আগামী কয়েক পুরুষের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে যেতে পারেন। স্বেচ্ছাচারী রাজনীতির শিকড় আরও গভীরে পৌঁছে দিতে পারেন। তিনি ফের তাঁর শিল্পকলার 'মাধুর্যে' বেআইনি টাকার হাওলাদের মুগ্ধ করে কোটি কোটি টাকা কামাতে পারেন। রাজ্যে শিল্পোদ্যোগীদের টানতে ঘন ঘন সপারিষদ বিদেশ ভ্রমণে যেতে পারেন। উন্নয়নের নামে রাজ্যের দরিদ্র জনগণকে ধোঁকা দিয়ে 'ভিখারি' ভোটারে পরিণত করতে পারেন। রাজ্যকে বিরোধীশূন্য করে তুলতে পারেন। রাজ্যের সমস্ত গণমাধ্যমগুলির দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী হয়ে উঠতে পারেন। তাঁর মুখের ওপর কথা বলার সব অধিকার যাতে খর্ব করতে পারেন এবং সর্বোপরি এমন ব্যবস্থা করতে পারেন যেদিন পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটিকে বকলমে বেচে দিয়ে বিদেশে গিয়ে গা ঢাকা দিতে পারেন।

চতুর্থ কারণ হতে পারে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কেন্দ্রের বিরোধিতায় তিনি বাম জমানার রেকর্ড সৃষ্টিকারী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর রেকর্ডও ভেঙে নিজে সর্বকালীন সেরা কেন্দ্র বিরোধিতার রেকর্ড গড়তে চাইছেন এবং তাঁর তখনকার বন্ধুজন সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি, তেলুগু দেশম প্রভৃতিকে দেখাতে চাইছেন, কেন্দ্র বিরোধিতায় তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়। না অখিলেশ যাদব। না মায়াবতী। না চন্দ্রবাবু নাইডু।

এহ বাহ্য! সবচেয়ে ভয়াবহ কারণ যেটি হতে পারে, সেই পঞ্চম কারণটি সম্ভবত তাঁর দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা। কেন্দ্রকে অগ্রাহ্য করতে করতে, রাজ্যব্যাপী একটা তীব্র কেন্দ্র-বিরোধী পরিস্থিতি তৈরি করে বাংলা নামে একটি বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্রের দাবি তোলা— তার প্রথম পদক্ষেপটি হলো তাঁর পরিকল্পিত 'বিশ্ববাংলা' লোগো যা আজ রাজ্য সরকারের লোগো হিসেবে চিহ্নিত এবং ব্যবহৃত। অশোকস্তম্ভ উঠে গেছে কবেই। বড়ো বড়ো রাস্তার মোড়ে, পার্কে, বাগানে, সমুদ্রপাড়ে, পাহাড়ি এলাকায় সর্বত্র ওই বিশ্ববাংলা লোগোটি সেজেগুজে দণ্ডায়মান। লক্ষণীয়, লোগোটিতে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান এমনভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যাতে পশ্চিমবঙ্গকে ভারতবর্ষের অধীন একটি রাজ্য বলে চেনাই যাবে না। মনে হয়, বাংলাদেশ, অসম ও ত্রিপুরার কিয়দংশ এবং পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে একটি পৃথক দেশের মানচিত্র।

একটু স্মরণ করুন, অদূর সম্প্রতিকালে রাজ্যের এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মন্ত্রী এবং বর্তমানে কলকাতা পুরসভার মেয়র, যিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে বিশ্বস্ত অনুচর সেই ফিরহাদ হাকিম প্রকাশ্যে বলেছিলেন, আগামী ২০ বছরের মধ্যে দুই বাংলা এক হয়ে যাবে। স্মরণ করুন, কয়েক মাস আগেই একটি মুসলমান ধর্মীয় সংগঠনের নেতারা কলকাতার ধর্মতলায় প্রকাশ্য সমাবেশে দাবি তুলেছিলেন, কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র করতে হবে একজন মুসলমান নেতাকে আর কলকাতা পুলিশের কমিশনারও করতে হবে মুসলমান অফিসারকে।

ওই সমাবেশে হাজির ছিলেন রাজ্যের আর এক মুসলমান মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। প্রথম দাবিটি মেনে মুসলমান মেয়র হয়েছে। অপেক্ষা, কে হবেন নতুন কমিশনার, তা দেখার। ইতিমধ্যেই এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র বিরোধিতা সহ মুসলমান প্রীতির আরও একটি উদাহরণ হলো কেন্দ্রের তিন তালাক বন্ধে বিধি প্রণয়নের বিরোধিতা করা। তাঁরই মন্ত্রীসভার সদস্য সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী সুপ্রিম কোর্টের রায়কে প্রকাশ্য জনসভায় চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন, তিন তালাক পদ্ধতি মুসলমান সমাজে ছিল, আছে, থাকবে। মমতা মেনে নিচ্ছেন।

যাদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক, কবি, লেখক, সাংবাদিক, চিত্র পরিচালক, যাঁরা 'বাংলা' রাষ্ট্রগঠনের দাবি তুলছেন বাংলা ভাষাকে বাঁচানোর অছিলায়। এঁরা যথেচ্ছভাবে সোশ্যাল মিডিয়াকে এই দেশদ্রোহী কাজে ব্যবহার করছেন। এদের মধ্যে যেমন রাজ্যবাসীরা রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন বাংলাদেশের কিছু কুখ্যাত ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সদস্যও। সম্প্রতি, অনুপ্রবেশকারী ঠেকাতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভারত সরকারের আইনসঙ্গত উদ্যোগে বাধা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার এবং শাসকদলের যে আপ্রাণ চেষ্টা, তাও যে বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যেই তা বলাই বাহুল্য। রাজ্যের নাম বদলে 'বাংলা' করার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবের মূলেও ছিল মুসলমান-প্রীতি। কারণ মুসলমান সাম্রাজ্যে এরাজ্য বাংলা নামে পরিচিত ছিল। তার আগে বা পরে নয় (দ্রষ্টব্য : বাংলাদেশের ইতিহাস/ প্রাচীন যুগ : রমেশচন্দ্র মজুমদার)। বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্রের চক্রান্ত নতুন কিছু নয়। ৮০-র দশকেই বাংলাদেশের একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি পূর্ববঙ্গের একাংশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমের একাংশ নিয়ে যুক্ত বাংলারাষ্ট্র গঠনের চক্রান্ত করেছিল। সেই চক্রান্তের শরিক ছিল উত্তরবঙ্গের একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী দলও। ওই দলটি এখন তৃণমূল কংগ্রেসের খুব কাছের এবং পছন্দের সংগঠন।

এমনটা নয় যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বা সরকার এসব অবগত নন। এমন হতেই পারে যে এটি একটি যৌথ প্রচেষ্টা অথবা প্রচেষ্টটা এপারের। ওপারের বাসিন্দারা অপেক্ষা করছেন, তিস্তার জল কোনদিকে শেষ পর্যন্ত গড়ায় তা দেখার জন্য। ততদিন ওপার বাংলার ইলিশ থেকে এপার বাংলার জনগণকে বঞ্চিত করে রাখবেই ওপারের হাসিনা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র বিরোধিতা সহ মুসলমান প্রীতির আরও একটি উদাহরণ হলো কেন্দ্রের তিন তালাক বন্ধে বিধি প্রণয়নের বিরোধিতা করা। তাঁরই মন্ত্রীসভার সদস্য সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী সুপ্রিম কোর্টের রায়কে প্রকাশ্য জনসভায় চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন, তিন তালাক পদ্ধতি মুসলমান সমাজে ছিল, আছে, থাকবে। মমতা মেনে নিচ্ছেন।

সর্বশেষ কেন্দ্র বিরোধিতার তীব্রতম নজির— রাজ্যের দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে আয়কর বিভাগের নির্দেশ না মানতে উস্কানি দেওয়া। দুর্গাপুজো কমিটিগুলোর আয় করযোগ্য কিনা এবং করযোগ্য হলে কর দিতে হবে কীভাবে সেসব বোঝানোর জন্যই আয়কর বিভাগ কিছু পুজো কমিটিকে ডেকে পাঠায়। মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে, দলীয় কর্মসূচির মঞ্চে বসে চিৎকার করে উস্কানি দিচ্ছেন, যাবেন না। কেউ যাবেন না আয়কর দপ্তরে। মেয়র ফিরহাদ হাকিম যার পুজো কমিটিও ডাক পেয়েছে, বলছেন, ''প্রণামি পড়ে পুজোয়। তার আবার আয়কর কীসের?'' অর্থাৎ প্রকাশ্যে দেশের আইনকে অবজ্ঞা করা। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে অপমান করা। মঞ্চে দাঁড়িয়ে মিথ্যাচার করা। রাজ্যের মানুষকে ভুল বোঝানো। একটা লঝঝড়ে সাইকেল, বিনা পয়সায় মিড ডে মিল, বিনা পয়সার বই-খাতা, বিয়ের জন্য টাকাপয়সা দেওয়ার নামে ভোটব্যাঙ্ক গড়ে তুলে তিনি ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন, ভারতবর্ষের না হোক, কোনো একদিন বৃহত্তর বাংলার প্রধানমন্ত্রী তিনিই হবেন।

তিনি ভারতবর্ষের সংবিধান মেনেই মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। আর মুখ্যমন্ত্রী হবার পর সংবিধান বিরোধী কাজ করে চলেছেন। কেন্দ্রীয় প্রকল্পকে গ্রহণ করে তা অস্বীকার করছেন। কোনো নিয়মকানুন, শৃঙ্খলা, সামাজিক সৌজন্যের ধার ধারছেন না। এত বাড়াবাড়ির এনার্জি উনি কোথা থেকে পাচ্ছেন। একথা তো এখন দিবালোকের মতোই স্পষ্ট যে তিনি বিদেশি শক্তির মদতেই ৩৪ বছরের বাম জমানাকে হটিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন। এখন কোন শক্তির মদতে তিনি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখছেন? একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই এখনও প্রকৃত বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ধর্ম বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। প্রকৃত বাংলার ধর্ম মানে বৈদিক ধর্ম, পৌরাণিক ধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম, জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, সহজিয়া ধর্ম। ইসলাম কখনই বাংলার ধর্ম নয়। কিন্তু এসব ইতিহাসকে গুলিয়ে দিয়ে, নব প্রজন্মকে বেকার, দরিদ্র এবং মূর্খ করে রেখে সব কিছুকে ভুলিয়ে দেবার জোরদার লক্ষণগুলি স্পষ্ট প্রতীয়মান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইদানীংকার বক্তব্য এবং আচরণে।

প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের আশু প্রয়োজন। এখনও সময় আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রয়েছে সমস্ত তদন্তকারী শক্তি। এবার তাদের ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার। অনেক দেরি হয়ে গেছে। এরপর কিন্তু রাশ আলগা করতে করতে একদিন খেই হারিয়ে যাবে। সেদিন আর হা-হুতাশের সুযোগও থাকবে না। বিজেপি নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ভুলের খেসারত দিতে হবে এপারে সৎ, পরিশ্রমী, ঐতিহ্যে বিশ্বাসী আধুনিক কৃষ্টিসম্পন্ন হিন্দু বঙ্গবাসীকে। ■

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার আট পাতা বৃদ্ধি এবং আংশিক রঙিন হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকদের কথা ভেবে আমরা পত্রিকার মূল্যবৃদ্ধি করিনি, পুরানো দামেই (১০ টাকা) এতদিন আমরা পরিবেশন করে এসেছি। কিন্তু ক্রমাগত ছাপার কাগজ ও অন্যান্য খরচ বেড়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই স্বস্তিকার মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ থেকে 'স্বস্তিকা'র প্রতি কপির দাম ১২ টাকা হচ্ছে। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা।

আশা করি, আমাদের অসুবিধার কথা অনুভব করে আপনারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

—সম্পাদক, স্বস্তিকা

বিশেষ প্রতিবেদন

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পতনকাল শুরু হয়ে গেছে

অমিতাভ মিত্র

সবেমাত্র ১ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে, দিনেরবেলায় বিভিন্ন রকমারি অনুষ্ঠান আর রাতেরবেলায় আমোদ-প্রমোদের ধকল কাটিয়ে তৃণমূল নেতা-নেত্রী-কর্মীরা একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। অনেকে আবার ছোটো দু-একদিনের ট্রিপে বেরিয়ে পড়েছে। ৯ জানুয়ারি বুধবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও যথারীতি প্রশাসনিক বৈঠকের নামে মিডিয়াকে বগলদাবা করে পার্টির বৈঠক ও শীতের আমেজ নিতে নদীয়া জেলায় পৌঁছেছেন, রাণাঘাটে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের ব্লাডব্যাঙ্ক সম্পর্কিত 'জীবনশক্তি' অ্যাপ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মঞ্চে বসে মাঝদিয়ার নলেন গুড়ের মোয়া খাচ্ছেন। ইতিমধ্যে দিদির মোবাইলে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ফোন। 'দিদি, বিষ্ণুপুরের সৌমিত্র খাঁ পালিয়েছে। দিল্লিতে দীনদয়াল মার্গে বিজেপির প্রধান কার্যালয়ে বিজেপিতে যোগদান করেছে, ওই 'বুড়োভামটা' এইসব করাচ্ছে।'

'বুড়োভাম' অর্থাৎ মুকুল রায় দিল্লিতে বিজেপি কার্যালয়ে মিডিয়াকে বললেন, 'আরও পাঁচ-ছ'জন লাইনে আছে, একটু অপেক্ষা করুন, সব দেখতে পাবেন।'

বাংলয় একটা প্রবাদ আছে, 'কাক তুমি পরের মাংস আনন্দ করে খাও, আর তোমার মাংস অন্য কেউ খেলে কা-কা করো।' মমতাদিদির অবস্থাও ঠিক এই রকম। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করার পর, প্রায় প্রতিদিন এই মুকুল রায়কে দিয়ে বাইপাসের তৃণমূলের প্রধান কার্যালয়ে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি ইত্যাদি দল থেকে এমপি, এমএলএ, কাউন্সিলার, পঞ্চায়েত সদস্য, বিভিন্ন পার্টি পদাধিকারীকে তৃণমূলের ছ'ইঞ্চি পতাকা হাতে ধরাতো। মুকুল রায় সাংবাদিকদের বলতেন, 'সবাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে শামিল হচ্ছেন। আগামী পঞ্চাশ বছরে বাংলায় তৃণমূল ছাড়া আর কোনো পার্টি থাকবে না।' দিদি নবান্নে মাঝে মাঝে গ্রাউন্ড ফ্লোরে মিডিয়ার সামনে মুচকি হেসে তেরো তলায় উঠে যেতেন।

সব ঠিকঠাক চলছিল, কিন্তু হঠাৎ করে নারদায় সিবিআই শমন সবকিছু এলোমেলো করে দিল। মুকুল রায়কে অন্যান্য তৃণমূল নেতা- নেত্রীদের সঙ্গে সিবিআই নারদা কেসে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে পাঠায়।

নির্দিষ্ট দিনে মুকুল রায় সিবিআই দপ্তরে হাজির হয়ে, বেশ কয়েক ঘণ্টা দপ্তরে কাটিয়ে হাসিমুখে বেরিয়ে আসেন। সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'আমার সঙ্গে সিবিআই অফিসারদের খোলামেলা কথাবার্তা হয়েছে, তাঁরা আমার উত্তরে সন্তুষ্ট। সিবিআই যতবার ডাকবে, ততবার আসব। আমার লুকোনোর কিছু নেই, যা কিছু করেছি পার্টির জন্য করেছি। উপর তলার নির্দেশে করেছি, ব্যক্তিগত স্বার্থে করিনি।' ব্যাস্, এই কয়েকটা সংলাপই 'কালীঘাটে' আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। মুকুল বিরোধী লবি, যার নেতৃত্বে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মাঠে নেমে পড়ল। মমতাদিদির কান ভাঙানো শুরু হলো। দিদিকে বোঝানো হলো, মুকুল রায় বিজেপির হাতে তামাক খাচ্ছে। ও গদ্দার। তৃণমূলের সর্বনাশ করছে। দিদিও বেশ কিছুটা থমকে গেলেন। যে মুকুল রায়কে দিনে পঞ্চাশটি ফোন ও এসএমএস করতেন, দু'দিন সবকিছু বন্ধ থাকল। দু'দিন পর মুকুল রায় কালীঘাটে তৃণমূল শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে ডাক পেলেন। বৈঠকে তিনি উপস্থিত হলেন। কিন্তু সব কিছুর মধ্যে যেন হৃদ্যতার অভাব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সঙ্গে যা হবার হয়ে গেছে। নতুন করে আর জোড়া লাগানো সম্ভব নয়। তবুও দু'জনেই গভীর জলের মাছ। সুতরাং দু'জনেই ওয়েট অ্যান্ড সি পলিসিতে ভর করে ডিপ্লোমেটিক ওয়েতে চলতে লাগলেন।

এরপর বেশ কিছুদিন দিদির সঙ্গে মুকুল রায়কে বেশকিছু অনুষ্ঠানে কলকাতা ও জেলায় দেখা যায়। অবশেষে ধর্মতলায় তৃণমূলের ঐতিহাসিক ২১ জুলাই সবকিছু জলের মতো পরিস্কার করে দেয়। সেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগে মঞ্চে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত মুখার্জি, ববি হাকিম, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণ রাখেন। ব্রাত্য শুধু মুকুল রায়।

সুতরাং ২১ জুলাই মুকুল রায় বুঝে গেলেন, আর তৃণমূলে দমবন্ধ করা অবস্থায় থাকা যাবে না। থাকলে হার্ট অ্যাটাক হয়ে মরতে হবে। এমন কিছু করতে হবে, যাতে তৃণমূল কংগ্রেসকে ঝাড়েবংশে ধ্বংস করা যায়।

উল্লেখ্য, মুকুল রায়ের সিবিআই দপ্তরে হাজিরা এবং ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ— এই সময়টুকু তৃণমূলের ইতিহাসে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সময়। তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায় মুকুল বিরোধী, কিন্তু মুকুল রায় তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হওয়ায় গোড়া থেকে তৃণমূলের সাংগঠনিক দিকটা দেখতেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মুকুলের উপর নির্ভর করতেন। তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম থেকে ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসা পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি যারা পরিশ্রম করেছেন, তাদের ধারাবাহিক সাজালে মমতা-মুকুল-পার্থ যারা এই ক্রমে আসে। সুতরাং পার্থবাবুর তিন নম্বর থেকে দু'নম্বরে আসা প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু নারদায় সিবিআই দপ্তরে মুকুল রায়ের হাজিরার পর পার্থবাবুর কাছে এক মোক্ষম সুযোগ আসে তৃণমূলের দু'নম্বর হওয়ার। তিনি কাল বিলম্ব না করে মাঠে নেমে পড়েন। মমতাকে বোঝান, মুকুল রায় আপনার পর তৃণমূলের এক নম্বর আসনে বসতে চাইছেন। আপনি এখনই তৃণমূলের ভাবী এক নম্বর ঠিক করুন, না হলে পার্টিটা শেষ হয়ে যাবে।

পার্থবাবু ‘কোরাস’ গাইবার জন্য ববি-শোভন-সুব্রতকে পেয়ে যান। দিদিও হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি ও ক্ষমতা কাকে দিয়ে যাবেন। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের বাইরে এত সম্পত্তি আর ক্ষমতা কাউকে কি দেওয়া যায়?

এখানে পার্থবাবুর ভূমিকা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। মুকুল রায় দু'নম্বরে থাকলে পার্থবাবু জীবদ্দশায় তৃণমূলের দু'নম্বরে আসতে পারবেন না। দু'নম্বরে আসার থেকেও বড়ো কথা মুকুল রায়কে তৃণমূল ছাড়া করা। তাতে নিজে তিন-চার-পাঁচ, যে নম্বরে থাকুন না কেন, অসুবিধা নেই। পার্থবাবুর শখ বলতে টিভিতে মুখ দেখানো আর নামের আগে ‘ডক্টরেট’ লেখা। ব্যস, বাকি জীবনটা তিন-চার- পাঁচ-ছয় যে কোনো নম্বরে ব্যাট করে যাবেন!

যাই হোক, মুকুল রায়কে নিয়ে আলোচনা করতে হলো, কারণ এই মুকুল রায় ‘বারুদের সলতে’ হয়ে ‘মমতা সাম্রাজ্য’ ধ্বংস করার, একটা ছোটো ‘ট্রেলার’ ৯ জানুয়ারি সৌমিত্রকে বিজেপিতে যোগদান করিয়ে দেখালেন। এতদিন মুকুল রায়কেও জল মাপতে হয়েছে, কারণ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি প্রধান বিরোধী তথা দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে, পঞ্চায়েত নির্বাচন-সহ সাম্প্রতিক বিধানসভা ও লোকসভা উপ-নির্বাচনে তারই উদাহরণ।

এতদিন মমতা ব্যানার্জি যে পুলিশের উপর ভর করে বিরোধীদের ভয়, ভীতি, মিথ্যা মামলা করে আটকে রাখার চেষ্টা করেছেন, সেই পুলিশ আর আগের মতো তাঁর কথা শুনছে না বা পাত্তা দিচ্ছে না। সরকারি চাকুরিজীবীদের মধ্যে একমাত্র পুলিশকেই দিবারাত্রি সমাজের সকল স্তরের মানুষের— চোর-ডাকাত, খুনি-আসামি থেকে এলিট শ্রেণীর ভাতের হাড়ির খোঁজ রেখে কাজ করতে হয়। সুতরাং সমাজের স্পন্দন পুলিশের চেয়ে ভালো কেউ বোঝে না। তারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনোভাব খুব ভালো করে বুঝতে পারছে। পরিবর্তনের পরিবর্তন আসছে। কিছু পুলিশ অফিসার আবার মমতা ব্যানার্জি-সহ তৃণমূল এমপি ও এমএলএ-কে পাত্তা দিচ্ছে না। নিজের মতো যা কিছু করছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে দিদির প্রশাসনিক বৈঠকে দেখা গিয়েছে স্থানীয় তৃণমূল এমএলএ মুখ্যমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে বলছেন, ‘দিদি, পুলিশ সুপারের সঙ্গে জীবনে আর দেখা করবো না, একটা কথা শোনে না। বলে যা করবার করে নিন। মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন।’ আরও বললেন, ‘স্থানীয় থানার অফিসারও কোনো কথা শুনছে না, আমাদের বালি, পাথর রাস্তা থেকে থানায় নিয়ে যাচ্ছে।’ মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় থানার অফিসারকে জিজ্ঞাসা করাতে অফিসার বলল, ‘থানার ঘর করতে বালি পাথর নিয়ে গিয়েছি, তাছাড়া বালি, পাথর প্রধান রাস্তার উপরে ফেলেছে।’ সঙ্গে সঙ্গে দিদি আমতা আমতা করে দু' পক্ষকেই সহযোগিতার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে উপদেশ দিলেন। পুলিশ অফিসাররাও বুঝে গেছেন যে দিদির দিন নির্দিষ্ট। তাছাড়া উনি বড়ো জোর সামান্য বদলি ছাড়া কী করতে পারেন!

অপরপক্ষে আই পি এস অফিসাররা আর আগের মতো কথা শুনছেন না, সেই অর্ণব ঘোষ, রাজীব কুমাররা সারদা-রোজভ্যালি কাণ্ডে যেমন সক্রিয় ছিলেন, আজ আর তেমন নেই। এরা আই পি এস অফিসার, সারা ভারত ঘুরে চাকরি করে খেতে হয়। ‘স্বৈরাচারী’ মুখ্যমন্ত্রীর জন্য সারাজীবনের ‘সার্ভিস বুকে’ লালকালির দাগ তুলতে আর চায় না।

আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, মালদা, নদীয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ প্রায় গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল চলছে। এই গোষ্ঠীকোন্দলের মূলে হলো যুব তৃণমূল বনাম আদি তৃণমূল। অর্থাৎ ভাইপো-পিসির ক্ষমতার আস্ফালন। যুব তৃণমূল বলে ভাইপো বেশি শক্তিশালী, তাই আদি তৃণমূলকে আমরা মারবো। অপরপক্ষে আদি তৃণমূল বলে, পিসি বেশি শক্তিশালী, যুব তৃণমূলকে আমরা মারবো। ফলস্বরূপ প্রতিদিন খুন, জখম, মারামারি। থানার অফিসার-সহ জেলার পুলিশ সুপারদের অবস্থা শাঁখের করাতের মতো। ভাইপো ফোন করে যুব তৃণমূলকর্মীকে ছাড়াতে আদেশ দিয়ে আদি তৃণমূলকে গ্রেপ্তার করতে বলে। আবার পিসিও ঠিক উল্টো কাজটি করছেন। অফিসাররা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকছে। বাড়িতে ছেলে-মেয়ে, বৌয়ের কাছে মুখ দেখানো লজ্জার ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে।

আই পি এস-দের মতো অবস্থা আই এ এস-দেরও, জেলাশাসক থেকে বিভিন্ন রাজ্য সরকারি দপ্তরে কোনো কাজ নেই। অবসরের আগেই ‘বিশেষ অবসরকালীন ছুটি’ কাটাচ্ছেন। মমতা ব্যানার্জির ক্লাব খয়রাতি, ধুলো-বালি উৎসব করতে সব টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজ শিকেয় উঠে গেছে। তাছাড়া সিএমও-র আদেশ ছাড়া কোনো কাজ করা বারণ। তাই সিএমও ছাড়া সব দপ্তর শীতঘুমে।

জেলাশাসক থেকে সচিবদের দপ্তরে কোনো কাজ ও লক্ষ্য না থাকাতে তারা ছোটোখাটো পারিবারিক সমস্যায় নিজের সাংবিধানিক এক্তিয়ার ভুলে গিয়ে থানায় ঢুকে ধৃত অভিযুক্তকে মারধোর করে পদের অবমাননা করছেন। যা আমরা আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক নিখিল নির্মলের ক্ষেত্রে দেখতে পেলাম। সুতরাং কিছু আই এ এস অফিসার বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আসলে এদের আর দোষ দিয়ে কী হবে? যখন রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানই স্বৈরাচারী দুর্নীতিগ্রস্ত, তখন তা ওপরতলা থেকে একেবারে নীচতলা পর্যন্ত গ্রাস করে।

মমতা ব্যানার্জির স্নেহের ভাই ববি হাকিম বলেছেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত মাথায় না থাকলে ববি হাকিম, ববি হাকিম নয়। সৌমিত্র খাঁ, সৌমিত্র খাঁ নয়। সব হিরো থেকে জিরো হয়ে যাবে।’ কিন্তু এটা বলেননি, যে বাংলার মানুষের হাত মমতাদিদির মাথায় না থাকলে, মমতাদিদি কী? এই সকল অবস্থা বিবেচনা করে তৃণমূলের বহু এমপি, এমএলএ নেতা-নেত্রী, কর্মীরা বিজেপির দিকে এক পা বাড়িয়ে আছে, শুধুমাত্র উপযুক্ত মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায়। সুতুরাং মমতা ব্যানার্জি যে মুকুল রায়কে দিয়ে অন্য পার্টির নেতাকর্মীদের ৬ ইঞ্চি তৃণমূলি পতাকা ধরাতেন, সেই মুকুল রায়কে দিয়ে এখন বিজেপি তৃণমূলি নেতা-কর্মীকে ৯ ইঞ্চি পদ্মফুল পতাকা ধরাচ্ছে। কারণ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। তাই মমতা ব্যানার্জি, নরেন্দ্র মোদীকে হিটলার মুসোলিনি বলে গাল দিয়ে লাভ নেই। এরপর শুধুমাত্র একটা সৌমিত্র খাঁ তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যাবে না। হাজার হাজার তৃণমূলকর্মী, সমর্থক বিজেপিতে যাবে। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভোট বিজেপিতে পড়বে। তখন পিসি-ভাইপোকে কালীঘাটে বসে বাঁশের বাঁশি বাজাতে হবে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। ■

বিশেষ নিবন্ধ

কবি-আতঙ্ক সিনড্রোমে ভুগতে পারে বাঙ্গালি

অভিমন্যু গুহ

নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর দুটি শব্দ-বন্ধনীর সঙ্গে বাঙ্গালি এখন অতি পরিচিত। প্রথমত, সহিষ্ণুতা। দ্বিতীয়ত, বাক্‌স্বাধীনতা। তবে এই দুটি বস্তু খায় না মাথায় দেয়, আম-বাঙ্গালি এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। তাঁদের না বোঝার বিস্তর কারণ রয়েছে। যাঁদেরকে 'অসহিষ্ণু' বলে নিত্য নৈমিত্তিক দেগে দেওয়া চলছে, সেই

শিলচরে একটি অনুষ্ঠানে শ্রীজাতকে জনতার প্রশ্ন। (ইনসেটে শ্রীজাত)

'অসহিষ্ণু'রা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বুদ্ধ ইন অ্যা ট্রাফিক জ্যাম' দেখতে গেলে 'সহিষ্ণু'রা যখন তাঁদের বেদম পেটান, এমনকী মহিলারাও নির্লজ্জতার মাথা খেয়ে তাতে হাত লাগান, তখন আভিধানিক 'সহিষ্ণুতা'র শব্দটির অর্থেরই পরিবর্তন ঘটে যায়। 'বাক্‌স্বাধীনতা' হরণের অভিযোগ তো আকছার শোনা যায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো 'বাক্‌স্বাধীনতা' যাদের হরণ করা হচ্ছে তাদেরই বাক্যবাণে সমাজের মাথাটাই ঘুলিয়ে যাওয়ার উপক্রম। আর 'বাক্‌স্বাধীনতা হরণকারী? তাদের বক্তব্য শোনবার 'সহিষ্ণুতা' সহিষ্ণুদের আছে কিনা, বাংলার সংবাদপত্রগুলিকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করার কোনও কারণ নেই। যদিও এই বাক্-(বাক্য)-এর স্বাধীনতা যে অচিরেই হরণ করা হবে তাতেও তো সন্দেহের কারণ দেখি না।

সুতরাং বাংলার মানুষ এই 'সহিষ্ণু' আর 'বাক্‌স্বাধীনতা'- ওয়ালাদের এতদিনে দিব্যি চিনে ফেলেছেন। ১৯৭৭ থেকে ২০১১ পরোক্ষে এঁদের সরকার চললেও মুখোশটা এতটা খুলে যায়নি, যতটা না মোদী-জমানায় এদের লাম্পট্য প্রকাশিত হতে পেরেছে। একথা সকলেই জানেন এবং মানেন যে, বাঙ্গালির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক যা যা মূল্যবোধ স্বাধীনতার পরেও টিম টিম করে টিকেছিল, চৌত্রিশ বছরের জমানায় আর সেটুকুও অবশিষ্ট থাকবার ফুরসত পায়নি। আজকের দিনের নিরিখে তার একটা হিসাব দেওয়া চলে। যেমন ধরা যাক রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত থাকা সত্ত্বেও কিংবা ব্যস্ত ব্যরিস্টারি পেশা সামলেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করেছেন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তেরা থাকা সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির আলাদা ঔজ্জ্বল্য ছিল। এবার দেখুন, আজকের সময়ে অতি বিখ্যাত রাজনীতিক-ব্যারিস্টার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেমন অসাধারণ কাব্যচর্চা করেন, সমকালে শঙ্খ ঘোষ কিংবা শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কেতাদুরস্ত কবি থাকা সত্ত্বেও। ফলে তখনকার চিত্তরঞ্জন-রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, আর এখনকার মমতা-শঙ্খ-শ্রীজাত এদের মান (স্ট্যান্ডার্ড) যাচাই করলেই আপনি তফাতটা বুঝতে পারবেন।

এতকথা বলার দরকারই পড়তো না, যদি না আজকের সময়ের ওই কবিদের চ্যালা-চামুণ্ডারা তাঁদের গুরুদের রবীন্দ্র-সত্যেন দত্তের উত্তরসূরী না বানিয়ে ছাড়তেন। স্বাধীনতার আগেও রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মধ্যে দেশভক্তি নিয়ে মতানৈক্য ছিল, কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে দু'জনের কথাই আমরা জানতে পারি। কিন্তু এবার বলুন

তো, যে শঙ্খ ঘোষ কোনও প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে গেলে নাকি একমাত্র শর্ত হিসেবে তাঁকে কথা না বলানোর বিষয়টি রাখেন, যাঁর ফেসবুকও নেই, টুইটারও নেই, সেই তিনি, কোথাও একটা কিছু ঘটলেই সে বিষয়টি জানুন আর নাই জানুন সর্বত্র 'অসহিষ্ণুতা'র ইন্ধন খুঁজে মন্তব্য করেন কেন?

আরও মজার ব্যাপার, যে পত্রিকা আর তার বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য প্রতিফলিত হয়, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি একদা যার মালিক স্বাধীনতা সংগ্রামে মদত জুগিয়ে জেল পর্যন্ত খেটেছিলেন, আজকে তাদের উত্তরসূরিরা পররাষ্ট্রপদলেহী হয়ে তাদের পূর্বজদের আক্ষরিক অর্থেই নরক দেখাচ্ছেন। ওই দৈনিকটির সম্পাদকীয় পাতায় নজর রাখলেই বুঝবেন কবি-কন্যার নকশালীয় ভাবনার অহরহ উপস্থিতি, 'আরবান' বা শহুরে নকশাল বস্তুটি ঠিক কী সেটা যাঁরা বুঝতে চান, পত্রিকাটিতে নিয়মিত নজর রাখলে যা বোঝার বুঝে যাবেন।

ওই পত্রিকায় দেশে 'সহিষ্ণুতা' নেই, বাক্‌স্বাধীনতা হরণ হচ্ছে--- গোছের চিলচিৎকার নিয়মিত আমাদের কর্ণগোচর হয়, কিন্তু এখনও কেউ দেখতে পেল না বিপরীত মতের কোনও মন্তব্য সেখানে ঠাঁই পেয়েছে বা তাদের চ্যানেল সন্ধ্যার ভাঁড়ামিতে বিপরীত মতাদর্শের প্রতি কোনও 'সহিষ্ণুতা' দেখিয়েছে বলে। এত কথা বলতেই হচ্ছে কারণ কাব্য-প্রতিভায় শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অবাধে ত্রিশূলে কন্ডোম পরিয়ে কোটি কোটি দেশবাসীর স্পর্শকাতরতায় আঘাত করতে পারেন, কিন্তু তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোই সেটা হয়ে যাবে গণতন্ত্রের কলঙ্ক, বাকস্বাধীনতা হরণ, অসহিষ্ণুতা আরও কত কিছু।

অথচ মজার ব্যাপার দেখুন, এই বিক্ষোভকারীদের ন্যূনতম বক্তব্যটুকু শোনার ধৈর্যও কেউ দেখাল না বটে, কিন্তু 'বুদ্ধ ইন আ ট্রাফিক জ্যাম' প্রদর্শন রুখতে যারা গুন্ডামি করল, হামলা চালান, পারলে তাঁদেরই জলজ্যান্ত শহিদের মর্যাদা দিতে পারলে যেন শান্তি পায় ওই সংবাদমাধ্যমের পুষ্যি ক্রীতদাস, থুড়ি সেবকেরা। আধুনিক মহামান্য কবিদের, যাঁরা মূলত কবিতা বাদ দিয়ে আর সবই লেখেন, বিশেষ করে 'অসহিষ্ণুতা'র প্রতি তাঁদের সংবেদনশীলতা প্রসব-যন্ত্রণাকেও অতিক্রম করে যায়। এঁদেরকে রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন দত্তের সমকক্ষ তো বটেই, পারলে তারও উচ্চে স্থান দিয়ে বাঙ্গালিকে কুক্কুট বানানোর প্রয়াসটি সুচতুর কৌশল ছিল বটে। তবে মোদী জমানা আর কিছু পারুক না পারুক এদের স্বরূপটা অন্তত চিনিয়ে দিয়ে যেতে পেরেছে।

এমনতরো 'কবি', 'অর্থনীতিবিদ', 'সাংবাদিক' তৈরির প্রয়াস সিপিএমের আমলে; ভারত-বিদ্বেষী, মানবতা-অসহিষ্ণু মাওয়ের চীনের আদর্শে যে দলের জন্ম তাদের ন্যাওটাদের হালও যে তেমনই, তা তো আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। বাম আমলে বুদ্ধিজীবী মানেই যেমন ছিল সিপিএম, হাল আমলে তেমনি 'লেফ্‌ট লিবারেল' নামক একপ্রকার সোনার পাথরবাটির জন্ম হয়েছে ধর্ম আর জিরাফে যাদের সহাবস্থান। এরাই নিজেদের অসহিষ্ণুতা ঢাকবার চেষ্টা করে, অন্যের বাক্‌স্বাধীনতা হরণ করে 'টেকিং অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে অন্যকে দোষারোপ করে।

আরেক মহামান্য কবি, যাঁর কবিতা অতি অখাদ্য বলেই কাব্য-রসিকেরা মনে করেন, যিনি বাম আমলে অতিবাম, এখন হাল আমলে অতি-মমতাপন্থী হয়ে একদা সদম্ভে প্রকাশ্য গোরু খেয়ে সাম্প্রদায়িকতা আর মৌলবাদ ইন্ধন দিয়ে বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতার নামাবলী গায়ে ঘুরে বেড়ান, যাঁর অন্য গুণেরও ঘাট নেই; তিনি ঘোষণা করেছেন যে শিলচরে গিয়ে নিজের নয় শ্রীজাতের কবিতা পড়বেন। তাঁর নিজের কবিতা আদৌ পাঠযোগ্য কিনা সেটা পরের ব্যাপার, তবে জল ঘুলিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা যে চলবেই (বিশেষ করে ২০১৯-এ যদি কিছু জোটে-টোটে) সেটা কবিকুল বুঝিয়ে দিয়েছে। ■

শ্রীজাতর অনুষ্ঠানে প্রতিবাদী দল

শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্য জগতে একজন তরুণ কবি। তিনি 'আনন্দ পুরস্কারে' বিভূষিত হয়েছেন। ১৯ মার্চ ২০১৭-তে তিনি 'অভিশাপ' নামে ১২ লাইনের একটি কবিতা রচনা করেন এবং ওই দিনই কবিতাটি ফেসবুকে পোস্ট করে দেন। ওই ১২ লাইনের কবিতাটিতে তিনি 'ত্রিশূলে কন্ডোম' নামক একটি শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন। যেদিন তিনি কবিতাটি ফেসবুকে পোস্ট করেন ওই দিনটিতেই যোগী আদিত্যনাথ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। 'ত্রিশূলে কন্ডোম' শব্দগুচ্ছ নিয়ে ওই সময় ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। হিন্দু সংহতি নামে পশ্চিমবঙ্গের একটি সংগঠনের পক্ষে জনৈক অর্ণব সরকার শিলিগুড়ি থানায় শ্রীজাতর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। পরে শিলিগুড়ি পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৫-ক ধারায় ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানার অভিযোগে মামলা করে শ্রীজাতর বিরুদ্ধে। এছাড়াও তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৫৭নং ধারায়ও তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। অন্যদিকে, ফেসবুক কর্তৃপক্ষের কাছেও শিলিগুড়ি পুলিশ বিতর্কিত কবিতাটির বিষয়ে জানতে চায়। ফেসবুক ওই সময় কবিকে ব্লক করে দেয়। যদিও একদিন পরই ব্লক তুলে নেওয়া হয়।

গত ১২ জানুয়ারি ২০১৯ (শনিবার) 'এসো বলি' নামে এক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শিলচর এসেছিলেন শ্রীজাত। অনুষ্ঠানে যখন সম্মাননা পর্ব চলছিল, তখন অল অসম বেঙ্গলি হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন (আভা)-এর সভাপতি বাসুদেব শর্মা শ্রীজাতর কাছে জানতে চান, তিনি কোন যুক্তিতে তার কবিতায় 'ত্রিশূল কন্ডোম' শব্দগুচ্ছ লিখেছিলেন? বাসুদেববাবুর বক্তব্যের সমর্থন জানান বজরং দলের গৌতম চক্রবর্তী, সঞ্জয় সিনহা সহ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের অন্যান্যরা। শ্রীজাত তাঁর এই উদ্দেশ্যমূলক স্ল্যাং এবং হিন্দুত্ববিরোধী শব্দগুচ্ছ সম্বন্ধে কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেননি, এমনকী তিনি প্রতিবাদকারীদের বক্তব্যের কোনো উত্তর দেননি। পরিণতিতে অনুষ্ঠানে এক বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। অর্ধ সমাপ্ত অবস্থায় এই অনুষ্ঠানে সমবেত হওয়া সকলেই নিরাপদে নিজ নিজ গৃহমুখে নির্গত হতে সক্ষম হন।

বাঙ্গালির লজ্জা, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন অনুষ্ঠানে বামপন্থীদের হামলা

অচিন্ত্য মণ্ডল

অতি সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল জাতীয়তাবাদী ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন পালনের আয়োজন করে। স্বামীজীর জন্মদিন ১২ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ১১ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন ও গরিব মানুষদের খাদ্য বিতরণের পরিকল্পনা নেয়। সেদিন সকালে স্বামীজীর ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য এবং মাল্যদানের পরে যে ব্যানারে অনুষ্ঠান শুরু হয় সেখানে স্বামীজীর ছবি-সহ লেখা ছিল প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা আয়োজিত স্বামীজীর জন্মদিন অনুষ্ঠানে গরিবদের শীতবস্ত্র ও খাদ্য বিতরণ। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বিভিন্ন কলেজ থেকে কয়েকজন আমন্ত্রিত প্রফেসর ছিলেন। অনুষ্ঠান ঠিকঠাকই চলছিল এবং বেলা বাড়তেই ভিড় বাড়ছিল। বিপত্তি ঘটে আমন্ত্রিত অতিথি প্রফেসর দেবাশিস চৌধুরীর বক্তৃতা নিয়ে। তিনি জে এন ইউ ক্যাম্পাসে বামপন্থীদের দেশবিরোধী স্লোগানের সমালোচনা করেন এবং বিবেকানন্দের সাম্যবাদ ও কমিউনিজমের সঙ্গে চীনের মাও সেতুংয়ের সাম্যবাদ ও কমিউনিজমের তুলনা করে ভারতবর্ষের জন্যে মাও অপেক্ষা কেন বিবেকানন্দের আদর্শ বেশি প্রয়োজন তা বোঝানোর চেষ্টা করেন। তাঁর বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এস এফ আই সমর্থকরা এসে তাঁকে ঘিরে ধরে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে, এমনকী মারধরের হুমকি দিতে থাকে। অবস্থা বুঝে তাড়াতাড়ি তাঁকে ক্যাম্পাস থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্ব গরিবদের শীতবস্ত্র এবং খাদ্য বিতরণ যা অনুষ্ঠানের মূলপর্ব সেটা আর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। একদল বামপন্থী ছাত্র এসে স্বামীজীর ছবি-সহ ব্যানার ছিঁড়ে নিয়ে চলে যায়। এই দৃশ্য দেখে আমন্ত্রিত গরিব মানুষ এবং শিশুদের অনেকেই ভয়ে চলে যায় এবং বাকি যারা রয়ে যায় তাদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা গেলেও খাবারের প্যাকেটগুলো তৎক্ষণে বেশিরভাগই উধাও হয়ে যায়। এটাই হলো নবযৌবনের প্রতীক, দেশপ্রেমিক ও বিশ্বজয়ী স্বামীজীর জন্মদিন প্রথমবার প্রেসিডেন্সিতে উদ্‌যাপনের 'মিষ্টি' অভিজ্ঞতা।

স্বামীজী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, ''ভারতবর্ষ পৃথিবীর একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ। আর এই বিশাল ভারতবর্ষকে জানতে হলে আগে বিবেকানন্দকে জানুন। তার মধ্যে নেতিবাচক কিছুই নেই। যা আছে সবই ইতিবাচক।''

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তনী হিসেবে স্বামীজীর জন্মদিন পালন অনুষ্ঠানে বামপন্থীদের হামলা প্রসঙ্গে আমার দু'চার কথা আবশ্যকতা রয়েছে :

যারা বাক্‌স্বাধীনতা, সাম্যবাদ এবং কমিউনিজমের পক্ষে আন্দোলন ও 'প্রচার' করে বেড়ায় তারা কেন ওই প্রফেসরের নিজস্ব মত প্রকাশের স্বাধীনতায় হামলা করে পুরো অনুষ্ঠানটাই পণ্ড করে দিল? যারা সারাক্ষণ গরিবদের জন্য 'খাদ্য চাই' বলে 'বিজ্ঞাপন' দেয় তারা কেন গরিবদের শীতবস্ত্র ও অন্ন বিতরণ অনুষ্ঠানটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে দিল না?

স্বামীজীর জন্মদিন পালনে বক্তব্য রাখছেন বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক দেবাশিস চৌধুরী।

২০১৪ সালে যখন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিস্ট্রি অর্নাসে ভর্তি হই তখন একটা জিনিস ভালোভাবে খেয়াল করি যে ভর্তির ঠিক পরপরই ক্যাম্পাসে নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের কীভাবে পরিকল্পিতভাবে 'ব্রেনওয়াশ' করানো হয়। শুরুটা করে ভর্তির সময় বিভিন্ন তথ্য, তারপর ক্লাসনোটস ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করে। তারপর বন্ধুত্ব বাড়িয়ে চায়ের আড্ডা থেকে শুরু করে গাঁজা, মদ ইত্যাদিতে আসক্ত করে যতদূর নিয়ে যাওয়া যায়। তারপর টার্গেট করা হয় ক্যাম্পাসে নবাগত কিছু সুন্দরী মেয়েকে, যাদেরকে নিয়ে আসা হয় 'বন্ধু' সার্কেলে। আর এগুলো করতে যারা সবচেয়ে বেশি দক্ষ তারা হলো এস এফ আই। এতসব করার পরও যদি দেখে ক্যাম্পাসে কেউ ওদের বিরোধী মত পোষণ করে তখন শুরু হয় চরম অসহযোগিতা এবং 'মধুচক্রে' ফাঁসানো। মধুচক্র মানে জাতীয়তাবাদী ছেলেকে মেয়ে কেসে এবং মেয়েকে ছেলে কেস দিয়ে পরিকল্পনা মাফিক কিছু কেচ্ছাকেলেঙ্কারিতে ফাঁসানো বা ব্লাকমেইল করে ক্যাম্পাসে পুরো চুপ করিয়ে দেওয়া। সবকিছুতেই যখন ব্যর্থ হয় তখন শুরু হয় মারার হুমকি।

ক্যাম্পাসে আমি যখন ভর্তি হই তখন প্রথমে জাতীয়তাবাদী তেমন কাউকে খুঁজে পাইনি। কারণ অনেকেই ভয়ে মত প্রকাশ করতে পারত না বা অনেকের ভয় থাকতো প্রকাশ্যে ভিন্নমত পোষণ করলে আর প্রেসিডেন্সির 'বুদ্ধিজীবী' তকমা পাওয়া যাবে না! ভর্তির মাসখানেকের মধ্যে 'হিন্দু হস্টেল' পেয়ে যাই। ক্যাম্পাস এবং হস্টেলে তখন আমিই প্রথম পাবলিকলি বলে বেড়াতাম যে প্রেসিডেন্সি ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাসে আমার হাত ধরেই প্রথম উত্থান হবে জাতীয়তাবাদী ছাত্রশক্তি এবিভিপি-র। অনেকেই আমার কথা শুনে হাসাহাসি শুরু করেছিল সেদিন, কিন্তু আমার কথাগুলো যে অমূলক ছিল নয় সেটা তারা বুঝতে পেরেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রথম ছাত্র সংসদ নির্বাচন পিইউএসইউসি-এ (প্রেসিডেন্সি ইউনিভারসিটি স্টুডেন্ট ইউনিয়ন কাউন্সিল) সবাইকে অবাক করে দিয়ে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট ক্লাস রিপ্রেজেনটেটিভ পদে নির্বাচনে লড়া এবং পরপর টানা তিনবার নির্বাচিত হওয়ায় (সার্টিফিকেট আছে)। দুঃখ একটাই, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সবাই আমার আদর্শ জানলেও এবিভিপি-র নাম দিয়ে লড়তে পারিনি। কারণ ক্যাম্পাসে তখন এবিভিপি-র ইউনিট ছিল না। কিন্তু লক্ষ্য থেকে আমি বিচলিত হইনি। ভিতরে ভিতরে খবর নিয়ে আমাদের মতাদর্শীদের খুঁজে বের করতে সমর্থ হয়েছিলাম যাদের অনেকেই আজকের প্রেসিডেন্সিতে জাতীয়তাবাদী কাজকর্মের নেতৃত্ব দিচ্ছে। প্রেসিডেন্সিতে আমার জীবন খুব একটা মসৃণ ছিল না। জাতীয়তাবাদী হওয়ার কারণে পেয়েছি চরম অসহযোগিতা, হুমকি সহ 'চাড্ডি' উপাধি। তখনই আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম প্রেসিডেন্সিতে স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের জন্মদিন পালনের সঙ্গে সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্', 'ভারত মাতা কী জয়' ধ্বনি তোলার। স্বপ্ন দেখেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রথমবার সরস্বতী পূজা উদ্‌যাপনের। 'প্রথমবার' বললাম কারণ আমি কোনোদিন ক্যাম্পাসে সরস্বতী পূজা হতে দেখিনি, আর আগে কোনোদিন হয়েছে বলেও কোনো খবর পাইনি। আর হবেই বা কী করে? বামপন্থী ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীদের আরাধ্য দেবী বহুদিন থেকে 'সাম্প্রদায়িক' তকমা নিয়ে বসে আছেন যে! তখন ক্যাম্পাসে 'হার্মাদ'দের হামলা সামলানোর শক্তি সামর্থ্য আমাদের ছিল না তাই সম্ভব হয়নি। কিন্তু যাদের খুঁজে পেয়েছিলাম তাদের সঙ্গে আমার স্বপ্ন এবং পরিকল্পনাগুলো শেয়ার করে এসেছিলাম। বিশ্বাস ছিল ওরা সেগুলো বাস্তবায়িত করতে পারবে। কারণ ক্যাম্পাসে তখন আমাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছিল। আজ হয়তো দূরে আছি, কিন্তু প্রেসিডেন্সি সবসময়ই ভালোবাসার জায়গা এবং প্রেসিডেন্সির সব খবরাখবরে আপডেট থাকি। প্রেসিডেন্সিতে স্বামীজীর জন্মদিন পালনের খবর পেয়ে আগে থেকেই আয়োজকদের বামপন্থী হামলার সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করেছিলাম। কারণ আমি দেখেছি কিছু আগে জে এন ইউ ক্যাম্পাসে বিবেকানন্দের মূর্তি স্থাপনে বাধা দিয়ে ওদের হিংস্র চেহারা। আশঙ্কা আমার সত্যি হলো, বিবেকানন্দের জন্মদিন অনুষ্ঠানেই প্রেসিডেন্সিতে হামলা করলো বামপন্থী তথা দেশবিরোধী ছাত্র সংগঠন। জে এন ইউ ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনে বিস্তারকের ভূমিকায় মাস খানেক কাজ করার সুবাদে খুব সামনে থেকে ওদের দেখার সুযোগ হয়েছিল। তারা জে এন ইউ-তে স্লোগান দেয় 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি', 'ভারত তেরে টুকরো হোঙ্গে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ' ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে এতকিছু বাধা বিপত্তির মাঝেও আমার যেসব ভাই-বোন কঠোর পরিশ্রম করে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করল তাদেরকে অনেক অভিনন্দন। প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী হিসেবে, আমার মতে এই অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব অনেক।

এই অনুষ্ঠানটির মধ্যে দিয়ে 'অচলায়তনের' উত্তর দিকের জানালা খুলে গিয়েছে! আমার বিশ্বাস, আগামী দিনে প্রেসিডেন্সিতে সরস্বতী পূজা হবেই! বাধা এলে মোকাবিলা করার অনেকে থাকবে। কেউ 'হিন্দু হস্টেল' নাম পরিবর্তন করতে চাইলে শক্ত হাতে তার জবাব দেবে! কারণ, হিন্দু হোস্টেলের একজন প্রাক্তন আবাসিক হিসেবে আমি জানি হিন্দু হস্টেল কেবল একটি নাম নয়, ২০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী পুরোনো প্রেসিডেন্সির অনেক আবেগ, ভালোবাসা ও স্বপ্ন। চোখের সামনে প্রেসিডেন্সিকে বদলাতে দেখেছি। আরও বদলাবে, গড়ে উঠবে জাতীয়তাবাদী শক্তির 'নতুন প্রেসিডেন্সি'। আমার স্বপ্নের প্রেসিডেন্সি হয়ে উঠবে আদর্শের প্রেসিডেন্সি। এ আমার বিশ্বাস! ▌

চিঠিপত্র

কংগ্রেসের ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে

শেষমেশ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ঝোলা থেকে আবার এক কালোবিড়াল বেরিয়ে পড়লো। এতদিন কংগ্রেসের মিছিলে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি শুনতাম তা যে নিছক ভারতবাসীকে বোকা বানাবার একটা নিপুণ কৌশলমাত্র ছিল, তা প্রমাণিত হয়ে গেল। অতি সম্প্রতি শেষ হওয়া মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থানের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস জয় পাওয়ার পর তাদের দলীয় বিজয় মিছিলে পাকিস্তানের চাঁদ-তারা মার্কা সবুজ ঝান্ডা নিয়ে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়ে অতি উৎসুক সমর্থকরা মাতামাতি করল এবং দাপাদাপি করল— এর নামই কি কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতা? দেশের খবরের কাগজ এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোর এ ব্যাপারে অদ্ভুত নীরবতা কিসের ইঙ্গিত বহন করে? পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের এরূপ আচরণে তাদের কী পরিণতির সম্মুখীন হতে হতো এ ব্যাপারটা কি ভুলে গেলে চলবে? পাকিস্তানে বিরাট কোহলির সমর্থক এক হিন্দু যুবক তার বাড়ির ছাদে ভারতের জাতীয়পতাকা টাঙানোর জন্য আদালতের বিচারে দেশদ্রোহিতার অপরাধে আট বছর জেল খাটছেন। শেষ অবধি ওই যুবক মেয়াদ শেষে জেল থেকে সুস্থ অবস্থায় বেরিয়ে আসবে এবং পরিবারের সঙ্গে মিলিত হবে এ বিষয়টা সে দেশের মহামান্য আদালত বলতে পারবে? এদেশে যারা কংগ্রেসের বিজয় মিছিলে পাকিস্তানের ঝান্ডা নিয়ে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি তোলে এদের মতলব কী? আমাদের অতি প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা এর মধ্যে কোন ধর্মনিরপেক্ষতা বা আন্তর্জাতিকতাবাদের দোহাই পেড়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের এই নিকৃষ্ট প্রচার করাটা মেনে নিতে পারলেন? কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব মধ্যপ্রদেশে 'বন্দে মাতরম্' সংগীতকে ব্যান করে একটা দেশেপ্রেমের নজির রেখেছেন। দেশবাসী যদি এরপরও কংগ্রেসের দুরভিসন্ধি বুঝতে না পারে তাহলে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে ভারতের জাতীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরার অপমৃত্যু বিধাতার বিধিলিপি হিসাবে মেনে নিতে হবে হতভাগা জাতিকে।

—**বিরূপেশ দাস,**
বর্ধমান।

অমর্ত্য সেনের অসহিষ্ণুতা টোট্‌কা বিতরণ

সম্প্রতি, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন দাবি করেছেন, দেশে অসহিষ্ণুতা বেড়েছে। নোট বাতিল করে সুফল পাওয়া যায়নি। আর বি আই গভর্নর উর্জিত প্যাটেলকে সরকারের পছন্দ হয়নি। তাই তাকে সরে যেতে হয়েছে। অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধির জন্য তিনি সমাজের পাশাপাশি রাজনীতিকেও কাঠগড়ায় তুলেছেন। সল্টলেকে রিজেন্সিতে ৭ জানুয়ারি একটি পত্রিকার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে অমর্ত্য সেন বলেন, 'এটা তো ঠিকই দেশে অসহিষ্ণুতা আগের তুলনায় বেড়েছে। এর পিছনে সামাজিক কারণ যতটা আছে, তার থেকে অনেক বেশি রাজনৈতিক কারণ রয়েছে। এর সঙ্গে দেশ চালনার কারণটিও রয়েছে। দেশে নিশ্চয় অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে। অঘোষিত বটেই এবং এটা ঘোষিত নয় মানতে হবে'।

কয়েকদিন আগে ১৯৮৪ সালের শিখ গণহত্যার রায় দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বলেছেন— "যাঁরা দাঙ্গার শিকার, তাঁদের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ থাকলেও শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় হয়। এই ধরনের অপরাধীদের পেছনে রাজনৈতিক মদত থাকে। তাই তারা দশকের পর দশক ধরে শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারে।" ওই রায়ে আদালত কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ সজ্জন কুমারের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন।

১৯৮৪ সালের শিখ দাঙ্গার পর ২০০2 সালে গুজরাটের গোধরা রেলস্টেশনে অযোধ্যা ফেরত ডাউন সবরমতী এক্সপ্রেসের দুটি কামরা বাইরে থেকে বন্ধ করে পেট্রল ঢেলে নারী শিশু সহ ৫৭ জন করসেবককে পুড়িয়ে মেরেছিল কংগ্রেসের গুন্ডারা। এছাড়া স্বাধীন ভারতে লক্ষাধিক কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিজভূমি থেকে উদ্বাস্তু হয়ে দিল্লিতে দীর্ঘদিন ঝুপড়িতে জীবন কাটানো, পশ্চিমবঙ্গের দেগঙ্গা, ক্যানিং, নদীয়া, বীরভূম, হাওড়া সহ বহু জায়গায় হিন্দুদের ধনসম্পত্তি লুঠ, অগ্নি সংযোগ, নারী নির্যাতন ঘটলেও আমাদের শ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবীকুল সেসব দেখতেও পান না, শুনতেও পান না। মনে হয় এই ঘটনাগুলিকে তাঁরা শান্তির বাতাবরণ বলেই মনে করেন। তাই তাঁরা মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন। শ্রদ্ধেয় অমর্ত্যবাবুও কোনোদিন এই বিষয়গুলি সহিষ্ণু বা অসহিষ্ণু কোনোটাই বলে উল্লেখ করেননি। কিন্তু তিনিই আবার বর্তমানে দেশে নিশ্চয় অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে বলে মন্তব্য করেছেন। অথচ ১৯৭৬ সালের ঘোষিত জরুরি অবস্থার কথা বলতে ভুলে যান।

তাছাড়া দেশভাগের পরেও উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক হিংস্রতা বর্বরতার পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য মুসলমান সম্প্রদায় (দু-চারজন বাদে) আজও বহন ও পালন করে চলেছে। লক্ষ লক্ষ নরনারী শিশু হত্যায় তাদের অনুশোচনা নেই। কারণ, সর্বক্ষেত্রেই তারা লাভবান। হিন্দু-শিখদের অপরিমিত বিষয় সম্পত্তির মালিক বনে গেছে তারা অনায়াসে। দুঃখবোধ হবে কেন? হিন্দুদের বিষয় সম্পত্তির উপর সেই একই ধরনের লোভ-লালসার জন্য এখনও অধুনা বাংলাদেশের অবশিষ্ট হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। তার বিরুদ্ধে তিনি একটি কথাও বলেছেন বলে শুনিনি।

অধ্যাপক অমর্ত্য সেন অর্থনীতিতে

সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী। তাঁর প্রতিভা বিশ্বসভায় স্বীকৃত। তারজন্য ভারতবাসী গর্বিত। কিন্তু অর্থনীতি বাদ দিয়ে তিনি কেন রাজনীতি নিয়ে চর্চা করতে গেলেন তা বোঝা গেল না। ওটা তো তাঁর এক্তিয়ার বহির্ভূত।

—**মণীন্দ্রনাথ সাহা,**
গাজোল, মালদহ।

এলো বাংলায় শুভদিন, প্রাণ খুলে বাজাও উন্নয়নের বীণ

সম্প্রতি বেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তৃণমূল নেত্রী রাজ্যের আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য ঢালাও মদের দোকানের লাইসেন্স দিয়ে চলেছেন। কাজটা কিন্তু তিনি আদৌ ঠিক করছেন না। কারণ এই দেদার লাইসেন্স প্রদানের ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের মধ্যে মদ খাওয়ার প্রবণতাও আগের তুলনায় বহুগুণ বেড়ে গেছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলে শুধু কটূক্তিই নয় মহিলাদের শ্লীলতাহানি থেকে শুরু করে প্রাণ নাশের ভয়ও বিরল ঘটনা নয়।

যথেচ্ছ যত্রতত্র মদ্যপান করাকে কেন্দ্র করে আবার অপরাধ প্রবণতার মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এসব বিষয়ে শাসকগোষ্ঠীর কোনো প্রকার ভ্রুক্ষেপই নেই। বরঞ্চ মদ খেয়ে মৃত্যু হলে তার পরিবারকে দুই লক্ষ টাকা অবধি আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। সরকার যে খয়রাতি সাহায্য তাদের করছে সেটাও কিন্তু শান্তিপ্রিয় জনগণের পকেট থেকেই আসছে। তাই জনগণের আজ ভেবে দেখার সময় এসেছে যে উন্নয়ন মানে কিন্তু বিষ মদ খেয়ে তাদের খয়রাতি সাহায্য দেওয়া নয়। উন্নয়নের প্রকৃত অর্থ জনগণের মঙ্গল কার্যে অর্থ ব্যয় করা।

অবশ্য এই সমস্ত মদ্যপায়ীদের দোষ দেওয়া যাবে না। কারণ এদের বেশির ভাগই বেকার শিক্ষিত যুবক। আর কতো দিনই তারা মা-বাবার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকবে? আগামী দিনে কোনও চাকরি পাবার অশাও ক্ষীণ। সুতরাং তারা বাধ্য হয়েই অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে। শহরে নাগরিকরাও নিরাপদ নয়। অবশ্য শাসক দল বলবে মদের জোগানের যথেচ্ছ লাইসেন্স দেওয়ার ফলে অধিক মদ বিক্রির কারণে সরকারের আর্থিক সঙ্গতি দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। কথাটা আংশিক সত্য হলেও এর ক্ষতিকারক দিকের দিকেও নজর দিতে হবে। জানি না আর কতোদিন রাজস্ব বৃদ্ধির নামে যথেচ্ছ মদের দোকান খোলার অনুমতি দেওয়া চলবে--- তা আগামী পরিস্থিতিই বলে দেবে। সিভিক পুলিশের পর এখন আবার সিভিক শিক্ষক চালু হয়ে গেল। উন্নয়ন আর কাকে বলে!

আজ গণতন্ত্রের নামে রাজনৈতিক নেতারা দেশটাকে অপসংস্কৃতির অবতল তলে নিয়ে যাচ্ছে। আর কবে যে জনগণের জ্ঞানচক্ষু খুলবে সেটাই দেখার বিষয়। দেশের উন্নয়ন মানে কিন্তু অপসংস্কৃতির উন্নয়ন নয়। ভারত হলো একটা প্রাচীন সনাতনী ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টিসম্পন্ন দেশ। আর এর সংস্কৃতিই এর একমাত্র প্রাণ ভোমরা। কথাটা যেন দেশের রাজনৈতিক নেতারা মনে রাখেন।

—**পাঁচুগোপাল ঘোষ,**
নরেন্দ্রপুর, হাওড়া।

বাধা দিয়ে স্বস্তিকার প্রসার বন্ধ করা যাবে না

প্রচারে বাধা দিয়ে স্বস্তিকার প্রচার বন্ধ করা যায় না। স্পষ্টকথা স্পষ্ট ভাষা স্বস্তিকার ধর্ম। স্বস্তিকা কাউকে ডরায় না।

হোমিও চিকিৎসার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ গুরুত্ব আরোপের সংবাদ ভালো লেগেছে। রোগ শুধু সারায় না, নির্মূল করে। ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। পূর্বের প্রাইভেটে পাশ করার প্রথা চালু হওয়ার প্রয়োজনে।

স্বস্তিকার মূল্যবৃদ্ধি পাচ্ছে, তবুও কিনবো, পড়বো, পড়াবো বরং অস্বস্তি লাগছিল কম মূল্যে কিনতে।

—**অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়,**
১, পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৬।

বঙ্গশ্রী

স্কুলেতে কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী
বিয়ের আগে রূপশ্রী
পথেঘাটে যুবশ্রী
তবু যুবকরা হতশ্রী!
নদীর ঘাটে বালিশ্রী
আসানসোলে কয়লাশ্রী
নির্বাচনে লাঠিশ্রী
প্রাথমিকে শিক্ষকশ্রী।
খাবার থালায় ভাগাড়শ্রী
কলেজগুলিতে ভর্তিশ্রী।
সীমান্তে আছে পাচারশ্রী
আর আছে সিন্ডিকেটশ্রী।
সাবধান ভারতবাসী
আর চাও কি কোনো শ্রী?
দিন গুনছে বঙ্গশ্রী
মা'কে করো না হতশ্রী!

—**সদানন্দ নন্দী,**
লাভপুর, বীরভূম।

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন
আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর
3 in 1 Account
(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
Find us on Facebook E-mail : drsinvestment@gmail.com

কীভাবে বাচ্চাকে বড়ো করবেন প্রত্যেক বাবা-মার শেখা দরকার

পায়েল ঘোষ

আজকাল ছেলে-মেয়ে মানুষ করার কথা উঠলেই বেশিরভাগ মা-বাবা বলে থাকেন এটা কি একটা শেখার বিষয় হলো? আমি বলব হ্যাঁ, একশোবার শেখার বিষয়। না হলে শ'য়ে শ'য়ে মা-বাবা কেন তাদের সন্তানকে নিয়ে এত চিন্তিত। এটাও ঠিক , যখন আমরা ছোটো ছিলাম তখন এই বিষয় নিয়ে এতটা তোলপাড় হয়নি। এখন সমাজে পরিকাঠামোগত সমস্যা দেখা দেওয়ায় মা-বাবার হাতে সন্তান প্রতিপালনের সময় খুবই কম। তাঁরা ভাবতেই পারেন না যে ছোটোরা শুধু শারীরিক ভাবেই বেড়ে উঠছে না, মানসিক ভাবেও তারা সমান ভাবে বেড়ে উঠছে। তাছাড়া পেরেন্টিং বিষয়ে অধিকাংশ মা-বাবার কোনো স্বচ্ছ ধারণাই নেই।

পেরেন্টিং সধোরণত চার প্রকার। প্রথম, অথরোটেরিয়ান পেরেন্টিং। এই ধরনের পেরেন্টিং স্টাইলে শিশুরা নানারকম নিয়মানুবর্তিতার ঘেরাটোপে বড়ো হয়। শিশুরা জানতেও পারে না কেন নিয়মগুলো তৈরি হয়েছে। ফলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মানসিকতায় বাবা-মার প্রতি ক্ষোভের সঞ্চার হয়। একটু বড়ো হতেই তারা এই ঘেরাটোপ ভেঙে লাগাম ছাড়া জীবন কাটানোতে আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে। গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে, এই ধরনের বাচ্চারা আত্মকেন্দ্রিক, পরনির্ভরশীল হয় এবং আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগতে থাকে।

দ্বিতীয়, পারমিসিভ পেরেন্টিং। এই ক্ষেত্রে বাচ্চার সবরকমের দাবি, জেদ বা বায়না বাবা-মায়েরা পূরণ করে থাকেন। শিশু অন্যায় করলেও তার দোষ দেখে না কেউ। যত বড়ো হয় তার নানা দোষ ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করে পরিবারের লোকেরা। এতে বাচ্চা প্রশ্রয় পায়। ফলস্বরূপ বাচ্চার মনে ভালো-মন্দ, নীতি-দুর্নীতির কোনো ধারণা তৈরি হয় না। স্বভাবতই বিভিন্ন রকম নেতিবাচক আচরণ খুব ছোটো থেকেই রপ্ত করে ফেলে তারা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। তখন হাজার চেষ্টা করলেও ঠিক পথে আনা যায় না।

তৃতীয়, ডিসকানেক্টেড পেরেন্টিং। আজকাল নিউক্লিয়ার পরিবারে বড়ো হয়ে ওঠা বাচ্চারা বড়োই একাকিত্বে ভোগে। বাবা-মা দুজনেই চাকরিজীবী হলে তো কথাই নেই। সারাদিন তাকে কেয়ার গিভার বা ক্রেশের ভরসায় দিন কাটাতে হয়। ক্লান্ত বাবা-মা বাড়ি ফিরেও তাঁদের কোয়ালিটি টাইম দিতে পারে না অনেক সময়। কোনো কোনো সময় নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অশান্তি, পরকীয়া – সবকিছুর আক্রোশ পড়ে অবোধ শিশুটির ওপর। ধীরে ধীরে তার স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ মন বিষাক্ত হতে থাকে এসবের প্রভাবে। ফলে একটু বড়ো হতেই বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। পড়াশোনা কিংবা খেলাধুলায় কানো রকম উৎসাহ তারা পায় না।

চতুর্থ, অথরোটেটিভ পেরেন্টিং। এক্ষেত্রে নিয়ম গণ্ডী সব কিছুই থাকে। কিন্তু প্রত্যেকটি নিয়ম কেন মেনে চলতে হবে তার যথার্থ বিশ্লেষণ দেওয়া হয় বাচ্চাদের কাছে। বাচ্চাকে অনর্থক 'মিথ' দুনিয়ায় বেঁধে রাখা হয় না। বাচ্চার কথা মন দিয়ে শোনা হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রকম আলোচনা করা হয়। বাচ্চাকে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয় আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠার। শুধু ভালো রেজাল্টের জন্য নয়, বিভিন্ন সোশ্যাল স্কিলের জন্যও বাচ্চা প্রশংসিত হয় তার মা-বাবার কাছে। ফলস্বরূপ ছোটো বয়স থেকেই বাচ্চার মধ্যে ভালো-মন্দ বিবেচনাবোধ তৈরি হয়ে ওঠে। বয়ঃসন্ধিকালে হাজার প্রলোভনও তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না।

প্রত্যেক মা-বাবাই চাইবেন তাঁর সন্তানের ক্ষেত্রে এই চতুর্থটি প্রয়োগ করতে। তাহলে আপনা থেকেই পরের ধাপগুলি আসতে থাকবে। যেমন, বাচ্চার মোবাইল ফোনের আসক্তি কীভাবে কমাবেন, বাচ্চার অতিরিক্ত চঞ্চলতা কীভাবে আয়ত্তে আনবেন, কর্মরতা মা এবং বাবা কীভাবে বাচ্চাকে গাইড করবেন, ফিজিক্যাল বুলিং ও সাইবার বুলিংয়ের শিকার হওয়া বাচ্চার আত্মবিশ্বাস কীভাবে বাড়াবেন, বাচ্চাকে আচার-আচরণ কীভাবে শেখাবেন, পরীক্ষার আগে বা তার পরে কীভাবে বাচ্চার মনোবল ধরে রাখবেন ইত্যাদি।

আমরা সবাই এই পৃথিবীতে একটা সুস্থ সামাজিক পরিবেশ চাই। আপনার শিশু আগামীদিনের সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে না উঠলে এ চাওয়াটা স্বপ্নই থেকে যাবে। আর আপনার সন্তান সঠিক ভাবে গড়ে না উঠলে সমাজে আপনার মর্যাদার কোনো দাম থাকবে না ।

(লেখিকা পেশায় পেরেন্টিং কনসালট্যান্ট)

পিক অসুখ ও হোমিওপ্যাথি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

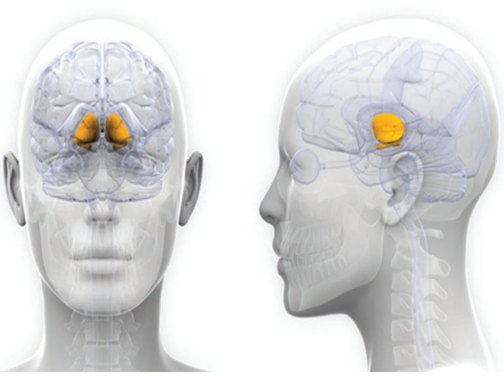

বিজ্ঞানী আর্নল্ড পিকের নামানুসারে এই রোগটির নামকরণ করা হয়েছে। ডিমেনসিয়ার মতো রোগ যখন চরম পর্যায়ে চলে যায় তখন তাকে 'পিক ডিজিজ' বলা হয়ে থাকে। মূলত ক্লিনিক্যাল এবং প্যাথোলজিক্যাল কিছু দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এই রোগটির নাম দেওয়া হয়েছে। পিক অসুখের ক্ষেত্রে সাধারণত ফ্রন্টাল লোব এবং অ্যান্টিলেটেরাল টেম্পোরাল লোব ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

স্নায়ুগত রোগগুলির মধ্যে অন্যতম জটিল রোগ হলো পিক অসুখ। ফ্রন্টোটেম্পোরাল ডিমেনসিয়ার মধ্যেই রাখা হয় এই অসুখটিকে। তাই ফ্রন্টাল লোবের মধ্যে নিউরোসাইকোলজিক্যাল সমস্যা দেখা দিলে তখন তাকে ফ্রন্টাল লোব ডিমেনশিয়া বলা হয়। ডাক্তারি মতে পিক অসুখ ফ্রন্টাল লোবের যে কোনও সমস্যার মতো মনে হতে পারে। তাই অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা পিক অসুখকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেন না।

এছাড়া সাবকর্টিক্যাল গ্লিওসিসকেও অনেক সময় পিক অসুখ বলে ধরে নেওয়া হয়। তবে সাবকর্টিক্যাল গ্লিওসিস খুব অ্যাডভান্সড বা উন্নত পর্যায়ে বলা গেলেও পিক অসুখের সম্ভাবনা থাকে। অন্যান্য ক্ষেত্রে ডিমেনসিয়াকে শারীরবৃত্তীয়ভাবে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, যা পিক অসুখের নামান্তর। এছাড়া এক ধরনের ক্লিনিক্যাল বা জিনগত সাইকোলিজিকেও পিক অসুখ বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে রোগটি ক্রোমোজম ১৭-র সঙ্গে সম্পর্কিত। পিক অসুখের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এমন একটি রোগ হলো প্রাইমারি প্রোগ্রেসিভ অ্যাপাসিয়া। এটি সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। তবে মূলত ফ্রন্টাল বা টেম্পোরাল লোবের কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়াকেই পিক বলে ধরে নেওয়া হয়।

সাম্প্রতিক একটি ক্লিনিকোপ্যাথোলাজিক্যাল সিরিজে দেখা গেছে যাদের প্রিফ্রন্টাল ডিমেনসিয়া ধারা পড়েছে, তাদের অন্তত পাঁচ শতাংশ ক্লাসিক্যাল পিক অসুখ রয়েছে। তাদের মস্তিষ্কের ব্যবচ্ছেদ করার পরই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন বিজ্ঞানীরা।

পিক অসুখের প্রভাব কতটা ?

১। পিক অসুখের ফলে বিভিন্ন রকম শারীরিক অক্ষমতার সৃষ্টি হয়। এই অসুখ ক্রমশ বড় আকার নিতে থাকে। ধীরে ধীরে রোগীর কোনও কোনও অঙ্গ চিরকালের জন্য অবশ হয়ে যায়। অ্যালজাইমার্সের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ছ'বছরের মধ্যে রোগটি প্রভাব দেখায়। কিন্তু পিক অসুখ তারও কম সময়ে তার প্রভাব দেখাতে শুরু করে।

২। কথা বলতে না পারা বা ভাষা বুঝতে পারার অসুবিধার মতো বেশ কিছু সমস্যাও এক্ষেত্রেও দেখা গেছে।

৩। পিক অসুখে মূলত পুরুষরাই বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকেন। মহিলারাও প্রভাবিত হন। তবে পুরুষদের থেকে কম।

৪। সাধারণত অ্যালজাইমার্স যে সময় মস্তিষ্কে থাবা বসায়, তার অনেক আগেই পিক অসুখ প্রভাব দেখাতে শুরু করে।

৫। মূলত ৫৫-৫৬ বছর বয়সের মধ্যেই সবথেকে বেশি রোগীর পিক অসুখ ধরা পড়েছে।

পিক অসুখের লক্ষণ :

১। হাসি কমে যাওয়া বা গোমড়া স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ।

২। চিকিৎসক যা জিজ্ঞাসা করেন তাই বার বার বলা, এমনকী চিকিৎসককে নকল করা। মূলত এই সমস্ত বিষয়গুলি পরীক্ষা করে দেখা হয়। ঘনঘন নাক ডাকা ঘুমিয়ে না থাকা অবস্থায় এবং কিছু ধরতে ও কোনও কিছু চুষতে অসুবিধা হওয়া পিক সুখের লক্ষণ।

৩। সাধারণ ছবি চিনতে না পারা, খুব সাধারণ নাম উচ্চারণ করা না পারার মতো সমস্যা দেখা দেয়।

৪। অ্যাকিনেশিয়া এবং প্যারাটোনিয়াও লক্ষ্য করা যায়।

৫। কাঁপুনি থাকলে তা আবার পারকিনসন্সের লক্ষণ এবং না থাকলে পারকিনসন্স প্লাস সিনড্রোমের লক্ষণ। তাই পিক সিনড্রোম যে অন্যান্য মস্তিষ্কের রোগের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত, সে কথা বলাই যায়।

৬। অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাক্য বলতে পারলেও তার ব্যাকরণ ঠিক থাকে না, এটাও পিক রোগের লক্ষণ। এই লক্ষণটিকে লোগোপেনিয়া বলা হয়।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা :

লক্ষণ অনুযায়ী ওষুধ ব্যবহার করা যায়। টিউবারকুলার ধাতুযুক্ত রোগী হলে তাকে টিউবার কুলিনম দেওয়া হয়। এছাড়া লক্ষণ অনুযায়ী জিঙ্ক সালফার, জিঙ্ক ভ্যাল, জিঙ্কোবাইলোবা, মার্ক অরেটাস, সিকুইটা, ভেরোসা প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার করা যায়। তবে কখনোই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। কারণ চিকিৎসক তার অভিজ্ঞতার আলোকে ওষুধের শক্তি নির্বাচন করে থাকেন, যা চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ■

বহুদিনের ফেলে রাখা কাজই নরেন্দ্র মোদী করছেন

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

২০১৫ সালে বিহার বিধানসভা নির্বাচন পর্ব চলার সময়ই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত সংরক্ষণ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন। বলেছিলেন, এদেশের সংরক্ষণ নীতিটির সংস্কার সাধন করা জরুরি। লালুপ্রসাদ যাদবের মতো জাতপাতের রাজনীতিতে সিদ্ধহস্ত রাজনীতিকের সরসঙ্ঘচালকের এই মন্তব্যকে বিকৃত করতে বিলম্ব হয়নি। লালুপ্রসাদ বিহারের সেই বিধানসভা নির্বাচনে প্রচার করেছিলেন সঙ্ঘ এবং বিজেপি সংরক্ষণ তুলে দিয়ে তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং অনগ্রসর পিছড়ে বর্গের ক্ষতি করতে চাইছে। ২০১৫-র বিধানসভা নির্বাচনে বিহারে বিজেপি পরাভূত হয়েছিল। নির্বাচনের পর অনেকেই বলেছিলেন এবং কিছু কিছু সংবাদমাধ্যমেও এমন মত প্রকাশ করা হয়েছিল যে, সরসঙ্ঘচালকের ওই বক্তব্যই বিজেপি এবং সঙ্ঘ পরিবার সম্পর্কে বিহারের এক অংশের ভোটদাতাকে বিরূপ করেছিল। এর কয়েকমাস পরে একটি একান্ত আলাপচারিতায় শ্রীভাগবতকে প্রশ্ন করেছিলাম— আপনারও কি মনে হয় না আপনার ওই বক্তব্যটি বিহার নির্বাচনে বিজেপির ক্ষতিই করেছিল? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কখনও নির্বাচনের লাভ ক্ষতি হিসাব করে কাজ করে না বা কথা বলে না। দেশের জন্য যা প্রয়োজনীয় সেই কাজটি করে এবং সেই কথাটি বলে সঙ্ঘ। সংরক্ষণ নীতির সংস্কার সাধন দেশের পক্ষেই জরুরি। এটা যে কতখানি জরুরি সেটা দেশের মানুষ নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে বুঝবে।' সংরক্ষণ নীতির সংস্কারের কথা যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালকই প্রথম বলেছেন— বিষয়টি কিন্তু এমনও নয়। সংরক্ষণ নীতিটি প্রণয়ন করার সময়ই বাবাসাহেব আম্বেদকর স্বয়ং বলে গিয়েছিলেন, এই নীতি দশ বছরের জন্য প্রণয়ন করা হলো। দশ বছর পর একে সংশোধন করা দরকার। অর্থাৎ বাবাসাহেব আম্বেদকর একটি সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের শৈশবাবস্থাতেই বুঝতে পেরেছিলেন, যে সংরক্ষণ নীতিটি প্রণয়ন করা হয়েছে সেটি কোনও চিরকালীন ব্যবস্থা নয়। সময় যত এগোবে, দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য এবং সামাজিক অবস্থারও যত পরিবর্তন ঘটবে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সংরক্ষণ নীতিরও সংস্কার দরকার। গত সত্তর বছরে এর আগে এদেশে যতগুলি সরকার ছিল, দুর্ভাগ্যের বিষয়, সংরক্ষণ নীতির সংস্কার সাধনের কথা তারা ভাবেনি বা এর প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেননি। ভাবেননি যে, তার একটি বড়ো কারণ, লালুপ্রসাদ, মায়াবতী, অখিলেশ যাদব, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতা-নেত্রীরা এবং তাদের পূর্বজ রাজনীতিকরা এই সংরক্ষণের নীতিটি ভাঙিয়েই জাতপাত ও তোষণের রাজনীতি করেছেন। করে চলেওছেন। যে কোনও সুস্থ চিন্তা ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই স্বীকার করবেন— দীর্ঘ সাত দশক ধরে চলে আসা এই সংরক্ষণ নীতি জাতপাত বা ধর্মীয় বৈষম্য তো দূর করতে পারেইনি, বরং এর ফলে বৈষম্য এবং দ্বেষ ক্রমশই বেড়েছে। সুস্থবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষরা এও নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, সংরক্ষণটা হওয়া উচিত একমাত্র আর্থিক অবস্থার বিচারে। জাতপাত বা ধর্মের বিচারে কখনই করা উচিত নয়। একমাত্র আর্থিক অবস্থার বিচারে সংরক্ষণই পারে ঠিক মানুষটির কাছে

জেনারেল কাস্টের মানুষদের জন্য আর্থিক অবস্থার বিচারে দশ শতাংশ সংরক্ষণের কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এটি একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ হিসেবেই চিরকাল চিহ্নিত হয়ে থাকবে। জেনারেল কাস্টের জন্য প্রধানমন্ত্রীর এই সংরক্ষণের ঘোষণাকে রাজনৈতিক পরিসরেও একটি মোক্ষম চাল বলে বিবেচনা করতেই হবে।

ঠিকমতো সংরক্ষণের সুফল পৌঁছে দিতে। সংরক্ষণের নীতিটির যাতে অপব্যবহার না হয়, ঠিকমতো তা যেন প্রযোজ্য হয় এবং ঠিক মানুষটির কাছে ঠিকমতো সুফলটি পৌঁছনোর জন্যই ২০১৫ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনের সময় সংস্কারের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছিলেন শ্রীভাগবত।

সাতটি দশক পরে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংরক্ষণ নীতির আমূল সংস্কারের কথা বলেছেন। বলেছেন, জেনারেল কাস্টের মানুষদের জন্য আর্থিক অবস্থার বিচারে দশ শতাংশ সংরক্ষণ থাকবে। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, এটি তাঁর কোনও ভোটের মুখে তাকিয়ে চটজলদি নেওয়া সিদ্ধান্ত নয়। বরং এরকম একটি চর্চা সঙ্ঘের ভিতর অনেকদিন ধরেই চলছিল। যার ইঙ্গিত ইতিপূর্বে পাওয়া গিয়েছিল সরসঙ্ঘচালককের কথায়। প্রধানমন্ত্রী সঙ্ঘের সেই ভাবনাকেই কার্যকর রূপ দিয়েছেন। তাঁর প্রথম দফার প্রধানমন্ত্রিত্বকালে তাৎক্ষণিক তিন তালাক নিষিদ্ধকরণের মতো এটিও একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ হিসেবেই চিরকাল চিহ্নিত হয়ে থাকবে। জেনারেল কাস্টের জন্য প্রধানমন্ত্রীর এই সংরক্ষণের ঘোষণাকে রাজনৈতিক পরিসরেও একটি মোক্ষম চাল বলে বিবেচনা করতেই হবে। কেননা, জাতপাত এবং মুসলমান তোষণের রাজনীতিতে পটু রাজনীতিকরা সরাসরি এই সিদ্ধান্তের বিরেধিতা করতে পারবেন না। অথচ তারা অন্তরে অন্তরে শঙ্কিত হবেন। শঙ্কিত হবেন এই কারণেই যে, অর্থনৈতিক অবস্থার বিচারে সংরক্ষণ চালু করার এটি প্রথম ধাপ। এর ফলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভারতীয় জনতা পার্টির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে বই কমবে না। বরং অন্যদিকে এতদিন তারা যে জাতপাত এবং মুসলমান তোষণের রাজনীতি করে আসছিলেন, সেই ঘৃণ্য রাজনীতির দিন এবার ক্রমেই শেষ হয়ে আসছে।

চলতি সংরক্ষণ নীতির ফলে যে কুফলগুলি পরিলক্ষিত হচ্ছে, সেগুলিও একটু পর্যালোচনা করে নেওয়া যাক। তাহলে বোঝা সহজ হবে, এই সংরক্ষণ নীতির আশু সংস্কার সাধন কেন জরুরি।

(১) সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষে সর্বশ্রেণীর তপশিলি জাতি উপজাতির জন্য সংরক্ষণ অবশ্যই জরুরি ছিল। কিন্তু দশ বছর পরে এই নীতিটির ধীরে ধীরে সংস্কার সাধনের কথা বলেছিলেন বাবাসাহেব আম্বেদকর। কিন্তু নীতিটি সংস্কারিত না হওয়ার ফলে অনেক অপাত্রেই সংরক্ষণের সুফল দান করা হচ্ছে। বহু তপশিলি জাতি উপজাতির মানুষ আছেন যারা স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে বংশ পরম্পরার সংরক্ষণের সুবিধা পেয়ে আজ সমাজে যথেষ্ট বিত্ত ও প্রভাবশালী। এদের কাছে সংরক্ষণের কারণে আর্থিক অথবা চাকরি বা শিক্ষাগত ক্ষেত্রে সুযোগ দেওয়া অনর্থক। বরং সমাজে আর্থিক এবং সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও এরা যদি এই সুবিধাগুলি ভোগ করে যান, তাহলে বলতেই হবে সুযোগের অপব্যবহার হচ্ছে। এছাড়াও, এই কারণে, অনেক সময়ই দেখা যাচ্ছে, তপশিলি জাতি- উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর দরিদ্র মানুষদের যাদের সত্যিই সুবিধা দরকার, অনেক ক্ষেত্রেই তারা তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

(২) এই সংরক্ষণ নীতির ফলে বিভিন্ন শ্রেণী এবং ধর্মাবলম্বীর মধ্যে বিভেদ এবং বৈষম্য বাড়ছে। বিভিন্ন শ্রেণী এবং ধর্মাবলম্বীর মানুষরা পরস্পরের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ছে। পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ মণ্ডল কমিশন গঠন করে সারাদেশে যে আগুন জ্বালিয়েছিলেন, তখনই প্রমাণ হয়েছিল, চালু সংরক্ষণ নীতি দেশের ভিতর বৈষম্য বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছু করতে পারেনি।

(৩) চালু এই সংরক্ষণ নীতি দেশের দরিদ্র মানুষদের ভিতরও বৈষম্য সৃষ্টি করছে। উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। তপশিলি জাতি উপজাতি বা মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত একটি দরিদ্র মানুষ সংরক্ষণের কারণে ঠিক যে যে সুবিধাগুলি ভোগ করেন, একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ বা সংরক্ষণের আওতার বাইরে পড়া শ্রেণীভুক্ত দরিদ্র মানুষ কিন্তু সেই সুবিধা পান না। বা একজন মুসলমান ইমাম বা মুয়াজ্জিন সরকারের বদান্যতায় যে ভাতা পান, একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিন্তু তা পান না। দরিদ্র মানুষদের ভিতরে এই বৈষম্য সৃষ্টি করা কিন্তু গত সাতদশক ধরেই চলে আসছে।

(৪) চালু এই সংরক্ষণ নীতির ফলে তোষণের রাজনীতির বাড়বৃদ্ধিও ঘটেছে এই দেশে। সংরক্ষণ নীতির দোহাই পেড়ে, তার অপব্যবহার ও অপব্যাখ্যা করে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে বঞ্চিত করে মুসলমান জনগোষ্ঠীকে অকারণ এবং অন্যায় সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। উদাহরণ, ইমাম ভাতা প্রভৃতি।

(৫) চালু এই সংরক্ষণ নীতির ফলেই অনেক ক্ষেত্রেই ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো উচ্চশিক্ষা এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে মধ্য মেধা ও নিম্ন মেধার লোকজন বাড়তি সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন। বঞ্চিত হচ্ছেন সংরক্ষণের আওতার বাইরে পড়া মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী এবং চাকরি প্রার্থীরা। ফলে দেশের অভ্যন্তরে মেধার ব্যবহারও ঠিক মতো হচ্ছে না।

এই বৈষম্য এবং অবিচারগুলি দূর করার জন্যই সংরক্ষণ নীতির সংস্কার সাধন এখন জরুরি। একমাত্র আর্থিক অবস্থার বিচারে সংরক্ষণ নীতি প্রণয়ন করা গেলেই জাতপাত ধর্মের বৈষম্যের অবসান, প্রকৃত মানুষের কাছে প্রকৃত সুবিধা পৌঁছে দেওয়া এবং তোষণের রাজনীতিকে চিরকালের জন্য বন্ধ করা যাবে। তবে, এটি একদিনে সম্ভব নয়, একদিনে হবেও না। সত্তর বছরের শ্যাওলা ধরা একটি জগদ্দল পাথরকে সরাতে সময় লাগবেই। তার জন্যই চাই প্রয়াস এবং ঐকান্তিকতা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেই প্রয়াস এবং ঐকান্তিকতা দেখিয়েছেন। আশা করাই যায়, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে আরও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফিরে এসে এই কাজটিকেই একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবেন নরেন্দ্র মোদী।

তবে জাতপাত এবং মুসলমান তোষণের রাজনীতিতে সিদ্ধহস্ত নেতা-নেত্রীরা সহজে তাদের জমি ছড়বেন বলে মনে হয় না। জাতপাত এবং ধর্মের নামে আরও একবার তারা দেশে আগুন জ্বালাতে নামবেন। জিগ্নেশ মেওয়ানির মতো তাদের এজেন্টরা এখনই যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই আশঙ্কাই হয়, এদের চক্রান্ত আরও গভীর হবে। তবে আশার কথা এই যে, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা নরেন্দ্র মোদীর পাশেই থাকবেন।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

গরিব ও মধ্যবিত্তের সংরক্ষণ ভারতীয় রাজনীতিতে যুগান্তর

শারদ এন. খারে

সাচার কমিটির রিপোর্ট :

● আইনসভার আসন সংরক্ষণ থেকে শুরু করে সরকারি চাকরি এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগ— ভারতে সংরক্ষণের নানা ধাপ আছে। ঐতিহাসিক ভাবে উপেক্ষিত বিভিন্ন জাতি ও জনজাতিকে সংরক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। সংবিধানে এরাই তপশিলি জাতি, জনজাতি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষ হিসেবে বর্ণিত। সংরক্ষণের উদ্দেশ্য এইসব জাতি ও জনজাতি যুগযুগান্ত ধরে যে অত্যাচার শোষণ ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে তার প্রতিকার করা এবং সমাজে এদের জন্য সম্মানজনক স্থান করে দেওয়া। সংবিধানে বর্ণিত সাম্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করাও সংরক্ষণের লক্ষ্য।

তপশিলি জাতি ও জনজাতি শ্রেণীভুক্ত মানুষ যাতে আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে জীবনযাপনের সুযোগ পান তার জন্য সংবিধানে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিগত কয়েক দশক ধরে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ করার ফলে তপশিলি জাতি, জনজাতি এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণীভুক্ত মানুষ তার সুফল পেতে শুরু করেছেন। সংরক্ষণ ব্যবস্থা পরিচালিত হয় দেশের সংবিধান, বিধিবদ্ধ আইন এবং স্থানীয় নিয়মকানুনের মাধ্যমে। তপশিলি জাতি, জনজাতি, পিছিয়ে পড়া শ্রেণীভুক্ত মানুষ এবং কয়েকটি রাজ্যে প্রান্তিক মুসলমানেরা সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ করেন। উল্লেখ্য, দেশের বেশিরভাগ মানুষই অসংরক্ষিত। এই নিয়ে তাদের মধ্যে ক্ষোভও আছে। অনেকেই মনে করেন সংরক্ষণের জন্য দেশে অন্য এক ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে।

বর্ণাশ্রম এবং জাতপাত :

হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী, জন্ম ও পেশা অনুযায়ী মানুষ চারটি বর্ণের অধীন— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ভারতের বর্তমান জাতপাত ভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে এই বর্ণাশ্রমের বিকৃত বিবর্তন বলা যেতে পারে। আমাদের দেশে সরকার-স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে এখন তপশিলিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৭.৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত। ১৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত তপশিলি জনজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এবং ২৭ শতাংশ আসন সংরক্ষিত পিছিয়ে পড়া শ্রেণীভুক্ত ছাত্র- ছাত্রীদের জন্য। শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই নয়, বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনক্ষেত্র এবং সরকারি চাকরিও সংরক্ষণের আওতায় পড়ে।

শিলংয়ের এন ই এইচ ইউ এবং রাজীব গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০ শতাংশ আসনই তপশিলি জনজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত। অন্ধ্রপ্রদেশের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ২৯ শতাংশ আসন পিছিয়ে পড়া শ্রেণীভুক্ত মানুষের জন্য সংরক্ষিত এবং সরকারি চাকরিতে মহিলারা ৩৩.৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের সুবিধা পান। পশ্চিমবঙ্গে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল, কলেজ ও সরকারি চাকরিতে তপশিলিভুক্তদের জন্য সংরক্ষণ ২২ শতাংশ, জনজাতিদের জন্য ৬ শতাংশ

দেশের কয়েকটি রাজ্যে সংরক্ষণের হিসেবটা এই রকম

রাজ্য	তপশিলি জাতি (%)	তপশিলি জনজাতি (%)	পিছিয়ে পড়া শ্রেণী (%)	অন্যান্য (%)	মোট (%)
হরিয়ানা	২০	—	৩৭	প্রতিবন্ধী ৩	৬০
তামিলনাড়ু	১৮	১	২০	৩০	৬৯
ঝাড়খণ্ড	১১	২৭	২২	—	৬০
মহারাষ্ট্র	১৩	৭	৩২	১৬	৬৮
কর্ণাটক	১৫	৩	৩২	—	৫০
কেরল	৮	২	৪০	—	৫০
উত্তরপ্রদেশ	২১	২	২৭	—	৫০
মধ্যপ্রদেশ	১৬	২০	১৪	—	৫০
বিহার	১৫	১	৩৪	—	৫০
রাজস্থান	১৬	১২	২৬	—	৫৪
উঃ পূঃ ভারত (ত্রিপুরা বাদে)	৮০ (সঃ চাঃ)	—	—	—	—
অন্ধ্রপ্রদেশ	১৫	৬	—	—	২১

এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণীভুক্ত মানুষের জন্য ৭ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের জন্য আলাদা করে সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা নেই। কিন্তু মুসলমান সমাজের আর্থিক এবং শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া, বিশেষ করে তাঁতি এবং মুচি সম্প্রদায়ের মানুষকে ওবিসি-১ এবং ওবিসি-২ এই দুই শ্রেণীতে বিধিবদ্ধ করে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য কোনও সংরক্ষণ পশ্চিমবঙ্গে নেই, কিন্তু প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষায় রয়েছে। (সূত্র : উইকিপিডিয়া)

মোদী সরকারের যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া :

মোদী সরকার অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া সর্বসাধারণের জন্য সরকারি চাকরি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১০ শতাংশ সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করেছে। এই সর্বসাধারণ কখনওই শুধু 'উচ্চবর্ণ' নয় অথবা শুধু হিন্দুও নয়। সংবিধান দ্বারা বিধিবদ্ধ ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের মাধ্যমে যারা এখনও সংরক্ষিত নন তারা সকলেই এই ১০ শতাংশ সংরক্ষণের আওতায় আসতে পারেন। হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান— যে কোনও ধর্মের আর্থিক দিক থেকে দুর্বল মানুষ এই সংরক্ষণের ফলে উপকৃত হবেন। এমনকী তপশিলি জাতি, জনজাতি এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণীভুক্ত মানুষের জন্য যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা এখন প্রচলিত রয়েছে তাও মোদী সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। ▮

সংবাদমাধ্যমের বিশ্লেষণ

উপকৃত হবেন ১৯ কোটি মানুষ

হিন্দুস্থান টাইমসের বিশ্লেষণ অনুযায়ী মোদী সরকারের নতুন সংরক্ষণ নীতির ফলে উপকৃত হবেন ১৯ কোটি (১৯০ মিলিয়ন) মানুষ। এখন ভারতের জনসংখ্যা আনুমানিক ১৩৫ কোটি। ২০১৫-১৬ সালের জাতীয় পরিবার ও স্বাস্থ্য সমীক্ষা অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার ২৬ শতাংশ কোনওরকম সংরক্ষণের আওতায় পড়েন না। এই তথ্য অনুযায়ী ভারতের অসংরক্ষিত জনসংখ্যা ৩৫ কোটি। যেহেতু মোদী সরকারের নতুন সংরক্ষণনীতি শুধুমাত্র সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, ৩৫ বা তার বেশি বয়েসীদের সুবিধাভোগী শ্রেণীর নামের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া দরকার। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতের মোট জনসংখ্যার ৬৮ শতাংশের বয়েস ৩৫ বছরের কম।

সুতরাং বলা যেতে পারে ২৩.৯ কোটি মানুষ এই সংরক্ষণ নীতির সুবিধা পেতে পারেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার গরিব এবং মধ্যবিত্তের সংরক্ষণ সংক্রান্ত যে বিল সংসদে পেশ করেছে তাতে পরিষ্কার, যেসব পরিবারের বার্ষিক আয় ৮ লক্ষ টাকা বা তার কম, তারাই গরিব/মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত হতে পারবে। সমস্যা হলো, ভারত সরকারের নিজস্ব কোনও পরিবারপিছু উপার্জনের তথ্যভাণ্ডার নেই। তাই, বার্ষিক আট লক্ষ বা তার কম, এরকম পরিবার ঠিক কতগুলি সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা শক্ত।

তবে একটু অন্যভাবে হিসেবটা করা যেতে পারে। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে মোট ৪৯.৯ কোটি আয়কর রিটার্ন জমা পড়েছে। তার মধ্যে ৩৫.৫ কোটি আয়করদাতার বার্ষিক আয় ৫.৫ লক্ষ টাকা বা তার কম। ৯ কোটি আয়কর দাতার বার্ষিক আয় ৫.৫ লক্ষ টাকা থেকে ৯.৫ লক্ষ টাকার মধ্যে। এই শ্রেণীভুক্ত আয়করদাতাদের গড় বার্ষিক আয় ৭.৪ লক্ষ টাকা। হিসাবের সুবিধার্থে একে আমরা ৮ লক্ষ টাকা ধরে নিতে পারি। আয়কর দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ৮০ শতাংশ আয়করদাতা এই শ্রেণীতে পড়েন। যদি ধরে নেওয়া হয় এই শ্রেণীতে জাত, সমাজ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশের বেশিরভাগ আয়করদাতা রয়েছেন তাহলে বলা যায় ২৩.৯ কোটি ৩৫ বছরের কম বয়েসী মানুষের মধ্যে ১৯ কোটি মানুষ মোদী সরকারের নতুন সংরক্ষণ নীতির মাধ্যমে উপকৃত হবেন।

গরিব ও মধ্যবিত্তের সংরক্ষণ : কাদের জন্য?

(ক) যাদের বার্ষিক আয় ৮ লক্ষ টাকার কম।
(খ) যাদের কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ৫ হেক্টরের নীচে।
(গ) যাদের ফ্ল্যাট/বাড়ির আয়তন ১,০০০ স্কোয়ারফিটের কম।
(ঘ) পৌর এলাকায় যাদের বাসযোগ্য জমির পরিমাণ ১০৯ গজের কম।
(ঙ) পঞ্চায়েত এলাকায় যাদের বাসযোগ্য জমির পরিমাণ ২০৯ গজের কম।

সংবিধান সংশোধনে সম্মতি দিলেন রাষ্ট্রপতি

চন্দ্রভানু ঘোষাল

মোদী সরকারের নতুন সংরক্ষণ নীতির ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া অসংখ্য মানুষ উপকৃত হবেন। উপকৃতদের মধ্যে যেমন রয়েছেন শহরে বসবাসকারী চাকরিজীবী ও পেশাজীবী মানুষ, তেমনই আছেন গ্রামের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা। কিন্তু সংরক্ষণের মতো একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে সংবিধানের মান্যতার প্রশ্ন উঠবেই। কারণ সংরক্ষণ মানুষের মৌলিক অধিকারভুক্ত একটি বিষয়। সুতরাং জেনে নেওয়া দরকার মোদী সরকারের এই সংরক্ষণনীতি সাংবিধানিক পরিসরে কতটা ন্যায্য। নীতি রূপায়ণে কোথাও যদি সাংবিধানিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় তাহলে তার জন্য সংশোধনী জরুরি কি না।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, মোদী সরকারের পক্ষ থেকে যেদিন অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া (সাধারণভাবে গরিব এবং মধ্যবিত্ত) মানুষের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করা হলো, সেদিনই বিশেষজ্ঞরা জানিয়ে দিয়েছিলেন এই নীতি রূপায়ণ করতে হলে সংবিধান সংশোধন করা দরকার। সেই কারণে সরকার দুটি বিল তৈরি করে। একটি সংরক্ষণ সংক্রান্ত অন্যটি সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত। আনন্দের কথা, সরকারের পেশ করা ১২৪তম সংবিধান সংশোধনী বিলটি সংসদের উভয় কক্ষে অনুমোদিত হবার পর রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো এবং রাষ্ট্রপতি বিলের প্রস্তাবের সম্মতি দেন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, সংবিধানে কী ধরনের সংশোধন করা হয়েছে? দুটি অনুচ্ছেদ সংশোধিত হয়েছে, আর্টিকল ১৫ এবং ১৬। দুটিই মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত। আর্টিকল ১৫ অনুযায়ী জাতি ধর্ম লিঙ্গ এবং জন্মস্থানের নিরিখে যে কোনওরকম

বৈষম্য নিষিদ্ধ। আর্টিকল ১৬ অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে সব ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ। সাম্প্রতিক সংশোধনী মারফত কেন্দ্র অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বলদের প্রতিও সব ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সেই সঙ্গে আর্টিকল ৪৬-এর ওপর বাড়তি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সংবিধানের এই ধারায় অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মোদী সরকারের এই সংরক্ষণ নীতি মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। রাজনৈতিক লাভক্ষতির অঙ্ক কষতে ব্যস্ত বিরোধীরা যতই একে 'নির্বাচনী চমক' বলে গালিগালাজ করুন, এরকম যে কিছু একটা হতে পারে তার ইঙ্গিত গত বছরের মে মাসেই পাওয়া গিয়েছিল। ইঙ্গিত দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং। বলেছিলেন, 'সরকার সংবিধান নির্দিষ্ট সংরক্ষণের সীমার মধ্যে থেকেই পিছিয়ে পড়া শ্রেণীভুক্ত মানুষদের আরও সুবিধা দিতে চায়। পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর আরও কিছু উপশ্রেণী হতে পারে কিনা, দেখার জন্য আমরা একটা কমিশন গঠন করেছি।' অনেকেরই হয়তো মনে পড়বে ন্যাশনাল কমিশন অন ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসকে আরও ক্ষমতা দেওয়ার জন্য ২০১৭ সালে ১২৩ তম সংবিধান সংশোধনী বিল প্রণয়ন করেছিল। বিলটি লোকসভায় পাশ হয় ২ আগস্ট, ২০১৭ এবং রাজ্যসভায় ৬ আগস্ট, ২০১৭।

সুতরাং, একথা বলা যেতেই পারে মোদী সরকার স্রেফ নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে কিছু করেনি। বহুদিন ধরেই অসংরক্ষিত মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। প্রশ্ন উঠতো, একজন বাহ্মণ কি গরিব হতে পারেন না? তথাকথিত 'উচ্চবর্ণে' তার জন্ম হয়েছে বলে কী মানে আছে তিনি বিপুল পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হবেন? এই ক্ষোভেরই প্রতিকার করেছেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানেন গুজরাটে সম্প্রতি ব্রাহ্মণরা সংরক্ষণের দাবিতে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে হরিয়ানাতেও। সেখানে বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন জাঠেরা। মোদী সরকারের নতুন সংরক্ষণ নীতির ফলে এরা সকলেই উপকৃত হবেন। আর তাতেই সিঁদুরে মেঘ দেখাচ্ছে কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি। কারণ এই সিদ্ধান্ত বিজেপির সামনে এক নতুন রাজনৈতিক পরিসর তৈরি করে দিয়েছে। বিজেপি যদি এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারে তাহলে উত্তর ভারতের জাতপাতের অঙ্ক অনেকটাই ঘেঁটে যাওয়ার সম্ভাবনা। তবে রাজনীতিতে যাই হোক মোদী সরকারের সংরক্ষণনীতি যে সাধারণ মানুষের পক্ষে হিতকারী সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রাণশক্তি যোগ সংস্থার আলোচনাসভা

পূর্ব কলকাতার বিধাননগরের আধ্যাত্মিক-সামাজিক সংগঠন প্রাণশক্তি যোগ সংস্থার বার্ষিক মিলন উৎসব গত ৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে। উৎসবে সংগঠনের পরিচালিত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিরা তাঁদের ব্যবহারিক জীবনে প্রাণশক্তি যোগের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

দৈনন্দিন জীবনে যাবতীয় টেনশন ও চাপ কাটাতে এই যোগ কতটা উপযোগী তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। সংগঠনের প্রাণকর্ত্রী ঋতি দাস ও তাঁর পুত্র ঋতব্রত দাস শুরুর সময় থেকেই সংগঠনের কর্মধারা ও তার উদ্দেশ্য-আদর্শ ব্যাখ্যা করেন। আর পাঁচটা যোগ প্রাণায়াম চর্চা কেন্দ্র থেকে কোথায় এর পার্থক্য তা দৃষ্টান্ত সহকারে তুলে ধরেন। সুষম খাদ্যাভ্যাস ও মৌলিক যোগ সাধনের সমন্বয় প্রক্রিয়ার ব্যবহারিক দিক নির্দেশ করেন তিনি। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ উৎপল মিত্র প্রাণশক্তির অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের অপার মহিমা ও শক্তির কথা ব্যাখ্যা করেন। আত্মা ও পরমাত্মার মেলবন্ধন এবং জীজগতের বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিষয়ে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেন। গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে মানুষের জীবন চর্যার যে সম্পর্কগত অবস্থান রয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে তা অষ্টাঙ্গ যোগের মাধ্যমে প্রদর্শন করেন ঋতব্রত দাস।

তাজপুরে শ্যামাপ্রসাদ ইনস্টিটিউট অব কালচারের প্রসাদ স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতা

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিন উপলক্ষ্যে গত ১৩ জানুয়ারি হাওড়া জেলার তাজপুরে শ্যামাপ্রসাদ ইনস্টিটিউট অব কালচারের উদ্যোগে প্রসাদ স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ৩০ তম বর্ষের চূড়ান্ত পর্বের এই খেলা তাজপুর অ্যাথলেটিক মাঠে খলিয়া ইউনিয়ন ফুটবল ক্লাব ও জয়পুর সাধনা সমিতির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় খলিয়া ইউনিয়ন ফুটবল ক্লাব জয়পুর সাধনা সমিতিকে ৫-৪ গোলে হারিয়ে বিজয়ী হয়।

প্রতিযোগিতায় আমতা ও জয়পুর থানার ২৮ টি দল অংশগ্রহণ করে। প্রাথমিক পর্বের খেলাগুলি দুই থানার বিভিন্ন মাঠে হওয়ার পর কেবল দুটি অর্ধচূড়ান্ত ও চূড়ান্ত খেলা তাজপুর মাঠে আয়োজিত হয়। স্বামীজীর সেবা ভাবনাকে স্মরণে রেখে খেলার মাঠে স্বর্গীয় আলোকলতা কাঁড়ারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ এলাকার দুঃস্থ প্রবীণ মানুষদের শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিশির ভট্টাচার্য। প্রসাদবাবুর স্মৃতিচারণ ও পারিতোষিক প্রদান করেন মোহনবাগান মাঠের বিশিষ্ট ফুটবলার শেখ ফৈয়াজ, এশিয়াডে সোনাজয়ী ক্রীড়াবিদ সোমা বিশ্বাস, এলাকার বিধায়ক অসিত মিত্র, আমতা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকান্ত পাল, তাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গোলাম খাঁ, বিশিষ্ট প্রসাদ অনুরাগী হাসেম খাঁ প্রমুখ। আমতা-জয়পুর অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা-সহ বহু মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে সরস্বতী শিশু মন্দিরের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও সংস্থার সদস্যদের সম্মিলিত শোভাযাত্রা পথপরিক্রমা শেষে 'প্রসাদ তীর্থ' সভাগৃহে স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

শ্রদ্ধা'র শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন

বীরভূম জেলার স্বনামধন্য সামাজিক সংস্থা 'শ্রদ্ধা' তাদের ১০৯ তম শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যাকে। গত ২ জানুয়ারি সিউড়ি সঙ্ঘ কার্যালয় কেশব তীর্থে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিদেন করা হয়। তিনবার ওঙ্কার ধ্বনি, উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ দয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন ক্ষেত্রীয় শারীরিক প্রমুখ বুদ্ধদেব মণ্ডল। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শ্রদ্ধার কাকলি দাস। শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও বিশ্বনাথ বিশ্বাস। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে পরিধেয় বস্ত্র,নামাবলী, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও মানপত্র প্রদান করা হয়। মানপত্র পাঠ করেন সন্তোয় রায়। অনুষ্ঠানে সিউড়ি শহরের বহু প্রবীণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বেণীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শিক্ষিকা শ্রীমতী চৈতালি মিশ্র।

গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স্ অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স্-এ রক্তদান শিবির

থ্যালাসেমিয়া রোগীদের কল্যাণে গত ১৬ জানুয়ারি কলকাতার গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স্ অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (জি আর এস ই)-তে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন জি আরএস ই-র চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডায়রেক্টর রিয়ার অ্যাডমিরাল

ভি কে সাক্সেনা। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার অর্থ বিষয়ক নির্দেশক এস এস ডোগরা, কর্মী বিষয়ক নির্দেশক এ কে নন্দা- সহ বহু আধিকারিক। শিবিরে সংস্থার কর্মচারী, বাণিজ্যিক সহযোগী, সিআইএসএফ-এর জওয়ান এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মী-সহ ১০০ জন রক্তদান করেন।

মালদহ নগরে আরোগ্য ভারতীর উদ্যোগে ধন্বন্তরী পূজা

গত ১৩ জানুয়ারি মালদা শহরে অরোগ্য ভারতীর উদ্যোগে নেতাজী সুভাষ রোডের সরস্বতী শিশু মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় আয়ুর্বেদের জনক ধন্বন্তরী পূজা। পুজো সমাপন্তে শরীর সুস্থ ও সবল রাখার জনা মানুষের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এক ঘণ্টা যোগাসন ও জিমন্যাসটিক্স প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ দীপক ঝা। অনুষ্ঠানে শহরের বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

টালা ঝিল পার্কে ন্যায় বিচারের দাবিতে মৌনমিছিল

'রাজ্য পুলিশে আর ভরসা নেই, সিবিআই তদন্ত চাই'—উত্তর কলকাতার টালা ঝিল পার্কে জনসুরক্ষা সঙ্ঘের গত ১১ জানুয়ারির প্রতিবাদসভা থেকে উঠে এল এই স্লোগান।

২০১১ সালের এই দিনেই ঘটেছিল সেই বেদনাদায়ক ঘটনা। পার্কের ভিতর পুরসভার রহস্যজনক গাড়ির ধাক্কায় নিহত হয়েছিলেন আরতি সেনগুপ্ত। বিচার কিন্তু মেলেনি আজও। পর্দার আড়ালে অপরাধীরা। ন্যায়বিচারের দাবিতে প্রতি বছরের মতো এবারও ১১ জানুয়ারি টালা ঝিল পার্কের ভিতর আরতি সেনগুপ্তের স্মৃতিফলক প্রাঙ্গণে প্রতিবাদী স্মরণভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজ্যপাদ স্বামী ধর্মস্বরূপানন্দ মহারাজ। তাঁর কণ্ঠেও শোনা গেল প্রতিবাদের সুর। স্মৃতিফলক প্রাঙ্গণে উপস্থিত শিশু-কিশোরদের হাতে চরিত্র গঠনে সহায়ক পুস্তক তুলে দেওয়া হয়। জনসমাজ কল্যাণ সঙ্ঘ আয়োজিত এই প্রতিবাদসভায় এলাকার সাধারণ মানুষ বিপুল সংখ্যায় যোগদান করেন। ছিলেন স্থানীয় স্বয়ংসবক ও বিজেপি কর্মীরাও। সভা পরিচালনা করেন অমল চাকি চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন আরতি সেনগুপ্তের সুপুত্র কিংশুক সেনগুপ্ত, স্বদেশ জালাল, দেবাশিস উপলা প্রমুখ। সভার শেষে এক বিশাল মৌনমিছিল এলাকার ৩, ৪ ও ৫নং ওয়ার্ড পরিক্রমা করে আগামীদিনে আরও লড়াইয়ের বার্তা ছড়িয়ে দেয়। সন্ধ্যায় দেশবন্ধু পার্কের প্রবেশদ্বারের সামনেও একই ছবি দেখা গেল। মোমবাতির আলোয় আয়োজিত প্রতিবাদী স্মরণসভায় যোগ দিলেন সাধারণ মানুষ। নিভে যাওয়া আরতির শিখা আবার যেন জ্বলে উঠল হাজারো মানুষের মধ্যে। বিদায় নেবার আগে প্রত্যেকে প্রত্যেককে অনুচ্চারিত কণ্ঠে যেন বলে গেলেন—অনেক লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে, দেখা হবে আবার আমাদের ১১ জানুয়ারি।

জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের সাংবাদিক সম্মেলন

গত ৮ জানুয়ারি কলকাতার প্রেস ক্লাবে জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক মঞ্চের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীর ইউজিসি নির্ধারিত অধ্যাপকদের অবসরের সময়সীমা ৬৫ বছর ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে কয়েকটি দাবিদাওয়া তুলে ধরেন সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়। দাবিগুলি হলো-- (১) ইউজিসি নির্ধারিত সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বেতনক্রম ১.১.১৬ থেকে কার্যকর করতে হবে এবং সময়মতো তা শিক্ষকদের প্রদান করতে হবে। (২) কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দ্রুত বেতন চালু করতে হবে। পে প্যাকেটের পরিবর্তে সরকারকে অন্য ধরনের ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হবে। কেননা পে প্যাকেট সাধরণত সরকার তিনবার কলেজগুলোকে প্রদান করে থাকে। পে প্যাকেটের কারণে পে ফিক্সেশন হলেও বেতন শুরু করতে দেরি হয়ে যায় তাই শিক্ষকদের দ্রুত বকেয়া মেটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। (৩) শূন্য পদে দ্রুত নিয়োগ করতে হবে ও নতুন সিবিসিএস পাঠ্যক্রম ঠিকমতো চালানোর জন্য নতুন পদ দিতে হবে। (৪) গ্রন্থাগারিক, শারীরিক শিক্ষার শিক্ষকদের এই কাঠামোতেই আনতে হবে। (৫) ছাত্র ইউনিয়নগুলির দুর্বৃত্তায়ন দন্ধ করত হবে। (৬) কাজ করার সময় শিক্ষকদের রাজনৈতিক ও শারীরিক নিরাপত্তা দিতে হবে। (৭) মহাবিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করা যাবে না। (৮) শিক্ষাঙ্গনে পঠনপাঠনের পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। (৯) নিয়োগের ক্ষেত্রে ইউজিসি নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। (১০) বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক নিয়োগ করে শিক্ষকদের প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে।

উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক কৃষ্ণ সরকার ও সংগঠন সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায়।

পরম্পরা

কালীঘাট পটের কদর ছিল ভারতব্যাপী

চূড়ামণি হাটি

কলকাতার আদি গঙ্গার পাশে বাহান্ন পীঠের অন্যতম কালীঘাট। একসময় পার্শ্ববর্তী ওই জলপথ ছিল গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম। পুরাকালে এই পথেই ভাগীরথী সাগরসঙ্গমে মিলিত হয়। পরে গতিপথের পরিবর্তন ঘটে। একদিকে পুরাণের কাহিনি নিয়ে কালীঘাট আর অন্য দিক দিয়ে রাজধানী কলকাতার বুকে এমন জনপ্রিয় তীর্থক্ষেত্র। যার ফলে নানা সময় নানা

কারণে মানুষের ভিড় জমে। কালীঘাটের চৌকো পটের শিল্পীরাও আসলে হঠাৎ আসা একদল গ্রাম্য শিল্পী। তারা কুমোর-সূত্রধর ও কয়েকটি পটুয়া পরিবার। মূলত দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুরের শিল্পীগোষ্ঠী।

কথিত, প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় কালীঘাটের মন্দির নির্মাণ করেন এবং ১৭৯৮ সালে সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশের সন্তোষ রায় এই মন্দিরকে নবরূপ দেন। এই সময় বেড়ে যায় ভক্ত সমাগমও। সে সময় জীবিকার সন্ধানে ছোটো ছোটো কয়েকদল গ্রাম্য শিল্পী নতুন ভাবে বাঁচার চেষ্টা চালালো। একই সঙ্গে পটুয়া-চিত্রকরদের জাতি- বর্ণ থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা। শ্রমনির্ভর কুটীরশিল্পকে আশ্রয় করে জনবহুল কলকাতার বুকে 'পাড়া' অর্থে সহজ ঠিকানা তৈরির চেষ্টা। অর্থাৎ উৎপাদনের পাশাপাশি বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে পরিচিতি পাওয়ার চেষ্টা। লক্ষ্মীর সরা, মনসা ঘট, চিত্রিত হাঁড়ি, রঙিন প্রতিমা, খেলনা পুতুল, রথচিত্র অলংকরণ, চালচিত্র, ছোটো-বড়ো মন্দির নির্মাণের পাশাপাশি গ্রাম্যশিল্পীরা শুরু করেছিলেন ধাতু পাত্রের উপর সরল চিত্রের অলংকরণ। ১৭৭০ সাল নাগাদ বিদেশি চিত্রশিল্পীদের আগমন। ১৭৮৫ সালে ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত বিদেশিরা ছবি আঁকা ও শেখানো দুই চালাতে শুরু করে। টমাস ড্যানিয়েল প্রকাশ করেন বাস্তব জীবন ও প্রকৃতির দৃশ্য নিয়ে ৮৪টি ছবি। এস সি বেলনোস সাধারণ জীবনযাত্রার ছবি প্রকাশ করেন তাঁর 'Manners in Bengal' বইতে। নানা সময় আলোচনার বিষয় হয়েছে অজন্তা রীতি থেকে আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুচিত্রের চর্চা। এসব দেখে ছবির বাজার বুঝেছিল কালীঘাটের শিল্পীরাও। যার ফল ঘটে পটের পুজোয় পটের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি ছবির জগতে একটি মিশ্ররীতি; তথাকথিত একটি আধুনিক রীতির জন্ম দিল কালীঘাটের শিল্পীরা তাদের আঁকা ছবিতে।

১৮৫৪ সালে কলকাতার গরানহাটায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর্ট স্কুল— ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট। ততদিনে কালীঘাটের পট দেখে বিদেশিরাও থমকে গেছে। কালীঘাটে ব্যাপক ভাবে পট তৈরির শুরুটা প্রায় ১৮৩০ সাল নাগাদ। সমাজ সচেতক রসিক হৃদয় থেকে ঠাকুর ভক্ত যাত্রী এবং ছোটোদের হৃদয়কে আনন্দে ভরিয়ে দিতো এ পট। এক ব্যতিক্রমী শিল্পমাধুর্য নিয়ে এ পট। বাজারি ছবির এ বিশেষ ঘরনা কালীঘাট অঞ্চলে বিক্রি হতো বলে এ ছবিগুলি নাকরণ হয়েছে 'কালীঘাট পেন্টিং'। মোটামুটি একশো বছর টিকেছিল এ ধারা। আর্ট স্কুলের চর্চাকে কেন্দ্র করে বাজারে এলো নানা ধরনের আরও সস্তায় হেটো ছবি। উত্তর কলকাতার বটতলা এলাকার চোরাবাগান আর্ট স্টুডিয়োর লিথোগ্রাফি এসেছে ১৮৭৮ সালে। কাঁসারি পাড়াতেও এ চর্চা গুরুত্ব পেয়েছে। অন্নদা প্রসাদ বাগচী আর্ট স্কুলে পাশকরা ছেলেদের নিয়ে বউবাজারে তৈরি করেছিলেন 'ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিয়ো'। পাথর খোদাই লিথোগ্রাফির পাশাপাশি কাঠ খোদাই মুদ্রণ চিত্র ছবির জগতে অন্য ভাবে ধরা ছিল। রঙিন এ ছবিগুলি ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। এসে গেল উন্নত প্রযুক্তিতে ছাপানো পট। হারিয়ে গেলো কালীঘাট পটের উজ্জ্বল ধারা। জনপ্রিয়তার শীর্ষে থেকে হারিয়ে যাওয়া। অবশ্য দু'-একজন শিল্পী শখের এ চর্চা ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। বেশির ভাগ শিল্পী বেছে নিলেন অন্য হাতের কাজ। ছবির বাজার খুঁজতে কেউ কেউ ছুটেছিলেন নবদ্বীপ-সহ নানা তীর্থে। কিন্তু এ ধারার চর্চা আর নতুন করে দানা বাঁধেনি।

কালীঘাট পটের শিল্পী প্রসঙ্গে বাঁশরী ঘোষের ছেলে ইন্দ্রমোহন ঘোষ এবং তার ছেলে নিবারণ ঘোষ (১৮৩৬-১৯৩০ সাল) ও কালিচরণ ঘোষ (১৮৩৮-'৩৫ সাল)-এর কথা উল্লেখ করতে হয়। এই সদ্‌গোপ পরিবারটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার গড়িয়া থেকে কালীঘাটে এসেছিল। কালীচরণ ঘোষের সঙ্গে কাজ করতেন বলরাম দাস। নীলমণি দাস,

ভাবনা দাস ও ভাবনা দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল দাস ছিলেন কালীঘাটপটের শিল্পী। কালীচরণ ঘোষের সন্তানরা হলেন কুমুদিনী, বলরাম, কানাই। আর দুই শিষ্যের একজন রেঙ্গুন চলে যাওয়া পরানচন্দ্র দাস এবং অন্যজন নবদ্বীপে চলে যাওয়া বলাই দাস বৈরাগী। নিবারণ ঘোষ ও বলরাম দাসের শিষ্য ছিলেন কালীঘাট পটের স্বনামধন্য শিল্পী রজনী চিত্রকর (১৮৯২-১৯৬৮ সাল)। রজনী চিত্রকরের সন্তানেরা হলেন রমানাথ পাল, শ্রীশ পাল, শম্ভু পাল। এর মধ্যে শ্রীশ পাল এ চর্চাকে ধরে রেখেছিলেন দক্ষতার সঙ্গে এ ধারার শেষ শিল্পী হিসেবে। তাঁর সন্তানরা হলেন নিখিল, অলোক, নিতাই। মেদিনীপুরের সুতাহাটা, আখপুর খেজুরতলা থেকে এসেছেন কালীঘাটে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার আকুবপুর থেকে কালীঘাটে আসা কার্তিক চিত্রকরের বংশধারায় আছেন গদাধর, গৌরাঙ্গ, গণেশ, প্রভাস, নারায়ণ এবং নারায়ণের ছেলে ধরণীধর ও মেঘনাদ। মেঘনাদের ছেলে উনিশ শতকের উদয় চিত্রকর। ওই একই সূত্র ধরে ভূষণ চিত্রকর। প্রাক্ উনিশ শতকের শিল্পী ছিলেন চিন্ময়ীলাল চিত্রকর। সমসাময়িক জনপ্রিয় শিল্পী মাথুর। মেদিনীপুরের চৈতন্যপুর আকুবপুর থেকে কালীঘাটে আসেন প্রাক্ উনিশ শতকের বরেন্দ্র চিত্রকর। বরেন্দ্র চিত্রকরের পুত্র পঞ্চানন চিত্রকর পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে শিবের রূপ ফুটিয়ে তুলতেন এক টানে। জহর চিত্রকরেরও নাম করতে হয়। উনিশ শতকের কুমার চিত্রকরের ছেলে কবিরাম চিত্রকর, তার ছেলে দুলাল আর দুলালের ছেলে ভাস্কর চিত্রকর কালীঘাট পটের গঠনশৈলীকে অনুকরণ করে আধুনিকতার রং ছড়িয়েছেন কিন্তু তা কালীঘাট পটের সমতুল্য না হলেও সুন্দর। ঠিক যেমন এখানকার অনেক প্রতিমা শিল্পী কালীঘাট পটের অনুকরণে তাদের মতো করে পট এঁকেছিলেন। অনুপ্রেরণার অভাবে এবং বাজার চাহিদার অভাবে সেগুলিও প্রায় হারিয়ে গেছে পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পীদের জনপ্রিয়তার আড়ালে থেকে। সেগুলিও আর এক ধরনের সুন্দর। বর্তমানে কালীঘাট শৈলীর পট তৈরিতে দক্ষতা দেখিয়েছেন মুর্শিদাবাদের ঝিল্লির রাশি পটুয়ার নাতি রামপুর হাটের কালাম পটুয়া। অনেক পটুয়া-চিত্রকর কালীঘাট পটের অনুকরণে পট আঁকার ঝোঁক দেখাচ্ছেন।

বিক্রির উদ্দেশ্য নিয়ে দ্রুত তালে এবং মাত্র কয়েক টানে মোটা কালো দাগ টেনে পটের বিষয় ফুটিয়ে তোলা হতো। আঁকা এবং রং করা এসব নিয়ে সমবেত প্রচেষ্টার সঙ্গে শিল্পীর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অপূর্ব মেলবন্ধন। কালীঘাট পটের শিল্পীরা জানে কেমন কাগজে কী রূপ গতিতে রঙিন তুলি চালনা করলে ঘন-পাতলা রঙের বিন্যাস ঘটে। তাদের জানা জল দিয়ে কীভাবে তুলির রং কাগজের উপর ফেলতে হবে। দক্ষ রেখার টান বহুমাত্রিক রঙের অভাব দূর করে দেয়। তবুও দর্শকদের নজর কাড়তে বিশেষ করে বাজারে আসতে থাকা সস্তার নতুন ধরনের ছবির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে দু-একটি রঙের প্রয়োগ ঘটান শিল্পীরা। পাতলা জল রঙের কাজেই মূল আকর্ষণ। আলতা আর ভূষো কালি প্রায় সব ঘরেই থাকতো। নীল আর হলুদের অভাব নেই। প্রাকৃতিক উপকরণ থেকেই তৈরি হতো আঠা ও রং। ঠাকুর রং করার গুঁড়ো রংও মাঠ-ঘাট থেকেই সংগৃহীত। এ চাহিদা মেটানোর জন্য রাজস্থান এগিয়ে। জার্মানি থেকে রং আসা শুরু হয় ১৮৫০ সাল থেকে। পাট ব্যবহৃত কাগজ হিসাবে চীনা কাগজ বা শ্রীরামপুরের পাতলা সস্তার কাগজ ব্যবহৃত হতো। বলাবাহুল্য, বাংলায় ভাতের মাড় ও আঁশতুলো দিয়ে কাগজ তৈরি করতেন শিল্পীরা। এদের বাসভূমি ছিল হাওড়ার আমতার কাছে ময়না, মুর্শিদাবাদের কৃষ্ণপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর, হুগলীর শ্রীরামপুর, মোগাইপাড়া, মদনা, নেয়ালা, সাহবাজার। সাধারণ কাগজই ছিল ছবি ফুটিয়ে তোলার মাধ্যম।

শীতল মনোরম হস্ত কৌশলে অপূর্ব ছন্দ ভাবের প্রকাশ। প্রায় বৃত্তের ব্যাসের অভগ্ন ছাঁচে মোটা কালো রেখার নিখুঁত লম্বা টানে ফুটে উঠতো নারীর শান্ত ভাব বা উত্তেজক কামনীয় রূপ। পুরুষ দেহে গতিশীল শক্তি বা ভগ্নরূপ। কাঁধে শাল, বকলস আঁটা জুতো, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, বাবরি চুল, পটলচেরা চোখ, ধনুকাকৃতির ভ্রূ নিয়ে 'বাবু পট' হলো মূল আকর্ষণ। এ পটে থাকে সৌখিন চেয়ার, হুকো, তন্বি মেয়ে, নাটকের মঞ্চ-সহ অনুসঙ্গিক নানা ধরনের বা চরিত্রের খণ্ড দৃশ্য। মূর্তির রেখাগুলির গভীরতা ফুটিয়ে তোলার জন্য মূর্তির পেছনে অন্ধকার পরিবেশ তৈরি করা হতো, যেন রাতের অন্ধকার। আর আলোর মধ্যে অন্তরঙ্গ লাবণ্য ও বাবু সংস্কৃতির ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা বা যৌনতা। রানির মুকুট যেমন সৌন্দর্যতা বাড়িয়েছে, তেমনি ইঁদুরের মাথায় বিবির পা বা সাপের মাথায় ব্যাঙের নাচন দৃশ্য বেশ হাসির উদ্রেক করে। নানা চরিত্র কালীঘাট পটের বিষয় হয়েছে। মন্দির দর্শনে আসা ভক্তদের জন্য তৈরি হয়েছে হিন্দু দেবদেবী ও পৌরাণিক বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে কিছু পট। যেমন রাসলীলা, কৃষ্ণলীলা, শিব-পার্বতী, কালী, নরসিংহ অবতার, কাকের পিঠে কৌমারী। পটের বিষয় হিসাবে ধর্মকথার বাইরে ঐতিহাসিক বিষয়ও গুরুত্ব পেয়েছে। যেমন লক্ষ্মীবাঈ, শ্যামাকান্তের বীরত্ব, শের খাঁ ও বাঘের লড়াই সহ নানা ঘটনা। সামাজিক বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে সাহেব পাড়া ও দেশি পাড়ার নানা ছবি। যেমন সতীর দেহত্যাগ, মাছকাটা, বর-কনে, স্ত্রৈণ স্বামী, মদ্যপ স্বামীর অত্যাচার, বাবু-ভণ্ডদের বেলাল্লাপনা, বিবি সুন্দরী, সাহেব, গোরা সৈন্য। নানা চরিত্র নিয়ে নানা ব্যঙ্গ দৃশ্য তুলে ধরে সমাজ সচেতনতার চেষ্টা। আর শিশুদের নজরে পড়ার জন্য তৈরি হয়েছে পশু-পাখির নানা ছবি। ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে সাপের ব্যাং শিকার, বিড়ালের মাছ বা পাখি শিকার কিংবা লব-কুশের হাতে বন্দি হনুমান। তৈরি হয়েছে শিয়াল রাজার গল্প-চিত্র। অর্থাৎ নানা বিষয়। তাই আজকের শিল্পীরা অনুভব করছেন বিশ্বের বাজারে কালীঘাট পটের দাম আছে এবং চাহিদাও আছে। পটুয়া চিত্রকরের সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত কালীঘাট পটের দিকে চোখ রেখে তার রহস্য খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেন। বিদেশিরা মজা পান সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত কালীঘাট পটে রঙ্গ রসিকতায় ফুটিয়ে তোলা বাবু চরিত্রের অধঃপতন দেখে। লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়ামেই আছে ৬৪৫টি কালীঘাট পট। পশ্চিমবঙ্গে আই সি এস গুরুসদয় দত্তের সংগ্রহটি বেশ উল্লেখযোগ্য। সেদিন নানা ধারার শিল্পীরা বাঁচার জন্য কালীঘাট পটে হিসাবে নতুন ধারার জন্ম দিয়েছিল; আর একশো বছর কাটতে না কাটতেই চিত্রশিল্পের নানা ধারার সংমিশ্রণ ঘটায় কালীঘাট পটের শিল্পীরা বাঁচার জন্য আবার অন্য মাধ্যমের আশ্রয় নিলেন। আর আজ চিত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা বাঁচার জন্য কালীঘাট পট তৈরির চেষ্টা করছেন কিন্তু তা মূলত অন্য ধারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে। ■

গয়া মাহাত্ম্য

অমিত ঘোষ দস্তিদার

বনবাসকালে চিত্রকূট পর্বতের উপর রাম, সীতা, লক্ষ্মণ বাস করছেন। রাজা দশরথের মৃত্যুর বছর পূর্ণ হয়েছে। পিতৃশ্রাদ্ধ করতে হবে। শ্রীরামচন্দ্র খুবই চিন্তায় আছেন— কীভাবে পিতৃ-সংবৎসর শ্রাদ্ধ করবেন। হঠাৎ শ্রীরামচন্দ্রের খেয়াল হলো তাঁর আঙুলে শেষ সম্বল একটি মাণিক্য-অঙ্গুরী রয়েছে। দুই ভাই ওই মাণিক্য-অঙ্গুরির বিনিময়ে পিতৃ-সংবৎসর শ্রাদ্ধের সামগ্রী আনতে গেলেন।

ফল্গুনদী-তীরে বসে সীতা বালি নিয়ে খেলা করে চলেছেন। তাঁর সেই খেলা আসলে জগৎসংসারের প্রণয়লীলা। তিনি একমনে স্মরণ করে চলেছেন তাঁর শ্বশুরঠাকুর রাজা দশরথকে। এমন সময় রাজা দশরথ আবির্ভূত হয়ে বধূমাতা সীতাকে সস্নেহে সংবৎসর শ্রাদ্ধ করতে বললেন। দশরথ সীতাকে জানালেন, তিনি বিলম্ব করতে আর পারছেন না। তিনি সীতার কাছে বালির পিণ্ড প্রার্থনা করলেন এবং জানালেন তাঁর কাছে সীতা রামেরই সমান। তাই পুত্র রামের অনুপস্থিতিতে সীতা তাঁকে পিণ্ডদান করতে পারে। রামের বিশ্বাসের অবগতির জন্য তিনি সীতাকে পিণ্ডদান ক্রিয়ার কিছু সাক্ষী রেখে অনুষ্ঠান সমাপন করতে বললেন। সীতা তখন ব্রাহ্মণ, তুলসী, ফল্গুনদী এবং বটবৃক্ষকে সাক্ষী রেখে ফল্গুনদীর বালি পিণ্ড হিসাবে দশরথকে দান করলেন। দশরথ তা সানন্দে গ্রহণ করে, তৃপ্ত হয়ে, সীতাকে আশিস জানিয়ে স্বর্গপথে গমন করলেন।

রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই পিতৃ-সংবৎসর শ্রাদ্ধের প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে ফল্গুনদীর তীরে এলেন। সীতা খুশিমনে দশরথের পিণ্ডগ্রহণার্থে আগমন এবং পিণ্ড গ্রহণ সমাপণান্তে স্বর্গপথে গমনের কথা দুজনকে জানালেন। তাঁরা দু'জনেই বিস্মিত হয়ে সীতার মুখের দিকে তাকালেন। সীতা তখন সাক্ষী স্বরূপ ব্রাহ্মণ, তুলসী, ফল্গুনদী এবং বটবৃক্ষে শরণাপন্ন হলেন। ব্রাহ্মণ, তুলসী, ফল্গুনদী সীতার বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষী দিলেন। রামের পক্ষে থাকার জন্য তারা তিনজনে দশরথের আগমন অস্বীকার করলেন। সীতা লজ্জায়, দুঃখে, রাগে ব্রাহ্মণকে অভিশাপ দিলেন— প্রচুর সম্পত্তি থাকলেও ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য দেশ-দেশান্তরে যেতে হবে। তুলসীকে বললেন— তার পাতা শ্রীহরির আদরের ধন হবে, কিন্তু চিরকাল সে অপবিত্রস্থানে আভূমি হয়ে জন্মাবে এবং শিয়াল-কুকুর তার গায়ে প্রস্রাব ত্যাগ করবে। ফল্গুনদীকে সীতা চিরকাল অন্তঃসলিলা হয়ে থাকার অভিশাপ দিয়ে বললেন তার শরীরের ওপর দিয়ে শিয়াল-কুকুর ডিঙিয়ে যাবে। বটবৃক্ষের কাছে রাম- লক্ষ্মণকে নিয়ে সঠিক সাক্ষ্যের জন্য সীতামাতা উপস্থিত হলে বটবৃক্ষ প্রথমে রাম-সীতার যুগলমূর্তি দর্শন করতে চাইলেন। রামের বামদিকে সীতা খুশিমনে দাঁড়ালেন। বটবৃক্ষ প্রণামরত অবস্থায় শ্রীরামচন্দ্রকে সত্য কথাই বললেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানালেন। শ্রীরামচন্দ্র সবকথা শুনে প্রসন্ন হয়ে বটবৃক্ষকে চিরজীবী, অক্ষয় অমর হয়ে থাকার আশীর্বাদ দিলেন। জানালেন সীতামাতা বটবৃক্ষকে বর দিয়ে বললেন, বটবৃক্ষ শীতকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মে শীতল হবে। তার ডালে-ডালে পল্লব বিস্তার করবে, মনোহর সুশীতল বটবৃক্ষ সর্বদাই আনন্দে থাকবে।

চিত্রকূট পর্বত ছেড়ে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ গয়াধামে গেলেন। সীতামাতা প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কাছে গয়া মাহাত্ম্য শুনতে চাইলেন। রামচন্দ্র সীতাকে বললেন গয়াধামে পিণ্ডদান করলে পিণ্ড গ্রহীতা বৈকুণ্ঠে স্থান পায়। সীতামাতা জগৎসংসারকে নিয়ে সেই কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন।

বহুকাল পূর্বে গয়াসুর নামে এক বিশালাকায় এবং মহাশক্তিধর দৈত্য ছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবতা গয়াসুরের পরাক্রমের কাছে আপারগ হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। তাঁরা গয়াসুরের শরীরের ওপর বসে যজ্ঞ করতে চাইলেন। গয়াসুর চিৎ হয়ে শুলে ব্রহ্মা ও শিব পৃথিবীর সমস্ত পাহাড় পর্বত গাছপালা গয়াসুরের দেহের সম্মুখভাগে স্থাপন করে ইন্দ্র-সহ দেবতাদের নিয়ে যজ্ঞ শুরু করলেন। যজ্ঞ শুরু হতেই ঘৃতের স্পর্শে অগ্নি মূর্তিমান হয়ে উঠলেন। সবাই ভাবলেন গয়াসুর বোধ হয় মারা গেছেন। যজ্ঞ শেষে সবাই যখন যজ্ঞের ফোঁটা কপালে পরছেন, তখন গয়াসুর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। গয়াসুর বললেন, হে দেবগণ! আপনারা আমার মৃত্যু নিয়ে খুব চিন্তিত, কিন্তু আপনাদের সবিনয়ে আমি জানাচ্ছি যে, আপনাদের কারুর হাতে আমার মৃত্যু হবে না।

এরপর নারায়ণ এলেন, গয়াসুরকে সম্মান প্রদর্শন করে নারায়ণ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন, নারায়ণ গয়াসুরের পরাক্রমে তুষ্ট হয়ে যথোচিত মর্যাদা দিয়ে, ক্ষমতা প্রদর্শনের নির্দিষ্ট সীমা স্মরণ করিয়ে তাঁকে পরাজয় বরণ করালেন এবং যথাযথভাবে চিরন্তন সম্মান প্রদর্শন করে গয়াসুরের মস্তকে তাঁর পাদপদ্ম স্থাপন করলেন।

বিষ্ণুপদে গয়াশিরে যে কেউ পিণ্ডদান করলে পিণ্ডদাতার মোক্ষধামে যাওয়ার পথ সুগম হয়ে থাকে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

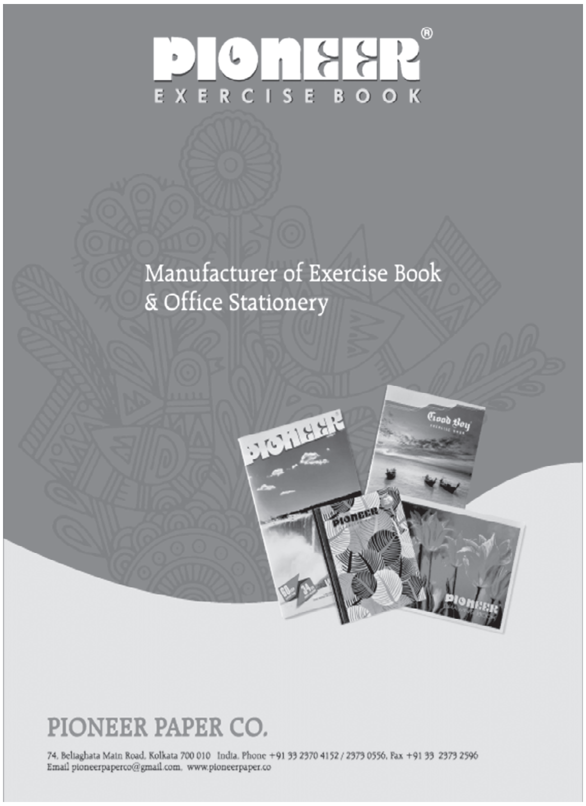

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

একটি প্রহেলিকাময় রাত

কৃষ্ণেন্দু ব্যানার্জী

মনোজ দত্তের আজকাল মনে হয় এই কলকাতা শহরটা কেমন যেন ঝিম্ মেরে নেতিয়ে গেছে। আগে কেমন উত্তেজনায় টগ্‌বগ্ করে ফুটতো। হতে পারে এটা তাঁর বয়সের জন্যও হচ্ছে। প্রবীণ বয়সে পৌঁছে আজকাল কোনোকিছু আর তেমনভাবে ভালো লাগে না। বাবুঘাটে গিয়ে রাস্তাটা পেরিয়ে নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আকাশবাণী ভবন পার হয়ে ইডেন গার্ডেনের কাছে গেলেই হাঁফিয়ে পড়েন। বুঝতে পারেন বয়স থাবা বসাচ্ছে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা দোতলার ব্যালকনিতে ইজি চেয়ারে বসে সে কথাই তিনি ভাবছিলেন। বহুকাল হলো অবসর গ্রহণ করেছেন, স্ত্রী-পুত্র-নাতি-নাতনিতে ভরা সংসার। ভাগ্যবান তিনি। ছেলে-বউ তাঁকে যথেষ্ট যত্ন-আত্তি করে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রেখেছে। এ ব্যাপারে তাঁর কোনও অভিযোগ নেই। চোখ বুজে মনোজ দত্ত এবার স্মৃতির অতলে ডুব দিলেন।

সেটা ছিল সত্তরের দশকের প্রথম দিক। উত্তাল সময়। অফিসের দীর্ঘদিনের সহকর্মী বোসদা আর কয়েকমাস পরই রিটায়ার করবেন। একদিন তিনি মনোজকে ডেকে বললেন, 'কাল একবার আমার বাড়ি আসিস তো। তোর সঙ্গে অফিসের অনেক ব্যাপারে আলোচনা করবার আছে। পরদিন অফিস ছুটির পর সন্ধ্যাবেলা সে যথারীতি বোসদার উত্তর কলকাতার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো। বোসদা আর মনোজ দুজনেই কাজপাগল। ওদের মধ্যে আলোচনা হতে হতে রাত নটা বেজে গেল। মনোজ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, 'বোসদা এবার উঠি গো। অনেকটা যেতে হবে।' বোসদা ওর সঙ্গে রাস্তার মোড় পর্যন্ত এলেন। বললেন, 'মিনিট পনেরো হেঁটে গেলেই বড়ো রাস্তা পাবি। সেখান থেকে বাস ধরে নিবি। রিক্সাও নিতে পারিস।' মনোজ বলে, 'তার দরকার হবে না। হেঁটেই মেরে দেবো।'

উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জি এলাকা। গলি তস্য গলি, তারপর আবার গলি। মনোজ হনহন করে হেঁটে চলেছে। আজ অবশ্য অফিস বেরোবার আগে বৌকে বলেছিল ফিরতে একটু দেরি হতে পারে।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা হৈচৈ গণ্ডগোলের আওয়াজ ওর কানে এল। আওয়াজটা ক্রমশ বাড়তে থাকে। হঠাৎ সে লক্ষ্য করলে আশপাশের দোকানের ঝাঁপগুলো ঝুপঝাপ বন্ধ হতে থাকলো। রাস্তাটা আস্তে আস্তে কেমন জনশূন্য হয়ে গেল। মনোজ দেখল একদল ছেলে মুখে কালো কাপড় বাঁধা— কারও হাতে ছুরি, কারও হাতে বোমা, কারও হাতে পিস্তল নিয়ে দুদ্দাড় করে তার পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল। কেউ একজন সন্দেহের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো। মনোজের এবার ভয় ভয় করতে লাগল। একটা বাড়ির বারান্দা থেকে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক ওর উদ্দেশ্যে বললে, 'আপনি আর এগোবেন না। কোনও একটা বাড়িতে ঢুকে পড়ুন।' সেইসময় সামনের একটা বাড়িতে এক ভদ্রমহিলা দরজা বন্ধ করছিলেন, তিনি বললেন, 'এখানে চলে আসুন।' মনোজ সেই বাড়িতে ঢুকলে ওই মহিলা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলেন, 'আসুন— দোতলায় চলে আসুন।'

সে ওই মহিলার পিছন পিছন সিঁড়ি

দিয়ে উঠে একটা বড়ো হলঘরের মধ্যে এল। সেখানে একটা গোল মেহগনি কাঠের টেবিল, তার লাগোয়া ছ'টা চেয়ার। মহিলা মনোজকে বলে, 'এখানে বসুন।' তারপর সিলিং ফ্যানটা চালিয়ে দিলেন। মনোজ দেখল ভদ্রমহিলার বয়স আন্দাজ তিরিশ-একত্রিশ হবে। মাঝামাঝি চেহারা। গায়ের রং ফরসা। বেশ সুন্দরী বলা যেতে পারে। ঠোঁটের নীচে একটা তিল আছে। হাসলে গালে হালকা টোল পড়ে। মাথায় একরাশ সযত্ন লালিত ঘনকালো চুল। মহিলা মনোজকে বললেন, 'দেখুন না কীসব আজকাল হচ্ছে। গণ্ডগোল যেন লেগেই আছে।'

মনোজ উত্তরে বলে, 'সত্যিই কী দিনকাল পড়লো! এখন বাড়ি ফিরবো কী করে ভাবছি। খুব টেনশন হচ্ছে।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'মনে হচ্ছে এ গণ্ডগোল সহজে থামবার নয়।' মনোজ ভয় পেয়ে বলে, 'তাহলে কী হবে?' এমন সময় পরপর দুটো বোমা পড়ার শব্দ হলো। ভদ্রমহিলা বললেন, 'দাঁড়ান বারান্দার দিকের দরজা-জানলাগুলো বন্ধ করে দিয়ে আসি।'

ভদ্রমহিলা চলে গেলে মনোজ বাড়িটা নিরীক্ষণ করতে লাগল। পুরানো আমলের বাড়ি— কড়ি বরগার ছাদ। শার্সি-খড়খড়ি দেওয়া জানলা। জানলাগুলো মেঝে থেকে উঠেছে। চারদিকের আসবাবপত্রের মধ্যে একটা আভিজাত্যের ছাপ আছে।

ভদ্রমহিলা ফিরে এসে বললেন, 'আজ মনে হচ্ছে আপনি আর বাড়ি যেতে পারবেন না। কষ্ট করে রাতটা এখানে কাটিয়ে দিন। ভোরবেলা চলে যাবেন।' মনোজ বললে, 'বাড়ির লোকজন খুব চিন্তা করবে। এখানে কোথাও টেলিফোন আছে কি?' ভদ্রমহিলা বলেন, 'না। এখানে কাছাকাছি কোথাও টেলিফোন নেই।' অগত্যা কী আর করা যাবে। ভদ্রমহিলা বলেন, 'আপনি ওই ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারেন। আমার কাছে জামাকাপড় আছে। চাইলে ড্রেস চেঞ্জ করতে পারেন।'

এরপর তিনি মনোজকে বাথরুমটা দেখিয়ে বলেন, 'যান ওখানে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিন।' মনোজ বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এলে ভদ্রমহিলা নির্দিষ্ট ঘরটাতে ঢুকে দেরাজের ওপর ব্যাগটা রাখল তারপর খাটের ওপর বসে পড়ল। এদিকে বাইরে তখন কুরুক্ষেত্রের লড়াই চলছে। মুহুর্মুহু বোমা-গুলির শব্দ সঙ্গে চিৎকার আর্তনাদ ভেসে আসছে। ভদ্রমহিলা ঘরে এসে বলে, 'চা খাবেন?' উত্তরে মনোজ বলে, 'না দরকার নেই।' তখন ভদ্রমহিলা আবার বলেন, 'রাতে আপনি কখন ডিনার করেন? কী খাবেন, ভাত না রুটি?' মনোজ বলে, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি রাত করেই খাই। আর তিনচারটে রুটি হলেই যথেষ্ট।' ভদ্রমহিলা ঘর থেকে বেরোতেই পাশের ঘর থেকে এক বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'চামেলি কে এসেছে?'

এই প্রথম মনোজ একজন তৃতীয় ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনলে। ভদ্রমহিলা ওই ঘরে ঢুকে অনেকক্ষণ ধরে কীসব কথাবার্তা বললেন। ঘর থেকে বেরিয়ে মনোজের চোখাচোখি হতে বললেন, 'আমার শাশুড়ি। দীর্ঘদিন ধরে বাতে ভুগে ভুগে প্রায় পঙ্গু হয়ে গেছেন।' মনোজ বলে, 'দুঃখের বিষয়।' এরপর মহিলা রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। মনোজ ঘরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। দেওয়ালে একটা বিদেশি ঘড়ি টাঙানো। অপর একটা দেওয়ালে অয়েল পেন্টিং ঝুলছে। এক মহিলা ঝরনার জলে স্নান করছে। শিল্পীর নিপুণ তুলির টানে আঁকা। এক কোণে ছোটো টেবিলে ফ্লাওয়ার ভাসে ফুলের তোড়া রাখা আছে। ওদিকে রান্নাঘর থেকে টুং টাং করে রান্না করার আওয়াজ কানে আসে। এসব দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যে মনোজের কেমন একটা ঘোর এল। অনেকক্ষণ পরে ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বরে তার চটকা ভাঙল, ''আসুন, খাবার দেওয়া হয়েছে।'' মনোজ বলে, 'আপনি খাবেন না?' উত্তরে মহিলা বলেন, 'আমি পরে খাবো।' মনোজ খেতে খেতে মহিলার সঙ্গে কথা বলে যা জানলো তাহলো ভদ্রমহিলার স্বামী কার্যোপলক্ষে বারাণসীতে থাকেন। একমাস, দুমাস অন্তর আসেন, দু' একদিন থেকে চলে যান। তাঁদের কোনও সন্তানসন্ততি নেই। ভদ্রমহিলাও মনোজের পরিবার সম্বন্ধে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করলেন। মনোজ বললে, 'আপনার হাতের রান্না খুব সুন্দর।' ভদ্রমহিলা হাসলেন। তাঁর দু'গালের টোল প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাবার পর মনোজ বাথরুমে গিয়ে পরিষ্কার করে হাত ধুয়ে ঘরে গিয়ে দেখে টান টান করে বিছানা পাতা। মশারি টাঙানো হয়েছে। ঘরের বারান্দার দিকে দরজা-জানলাগুলো খোলা। মনে হয় এখন গণ্ডগোল থেমে গেছে। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো আসছে। মনোজ বারান্দায় কিছুক্ষণ পায়চারি করে মশারি তুলে বিছানার মধ্যে ঢুকে পড়লো। বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম এল না। পরিবর্তে নানা দুশ্চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। বাবা ব্লাড প্রেশারের রুগি। মায়ের সুগার আছে, তার ওপর বাত। তারা এখন কী করছে কে জানে! স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা হয়তো কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। মনোজ অফিস থেকে দেরি করে ফিরলে ছোটোকাকা উদ্বিগ্ন হয়ে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আজও কি ছোটোকাকা সেভাবে দাঁড়িয়ে আছে? থানায় নিশ্চয় পাড়াপ্রতিবেশীদের ভিড় জমেছে। ছবিগুলো কল্পনা করে সে অস্থির হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ পরে খুট্ করে আওয়াজ হতে সে সচকিত হয়ে ওঠে। দরজার পর্দার ফাঁক দিয়ে সেই ভদ্রমহিলাকে

দেখতে পেল। কিন্তু একি, ভদ্রমহিলার কী আমূল পরিবর্তন! দেখে ওই মহিলা একটি পাতলা ফিনফিনে শাড়ি পরেছেন। সঙ্গে স্লিভলেস ব্লাউজ। শরীরের প্রতিটি ভাঁজ দেখা যাচ্ছে। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে হাওয়ায় উড়ছে। চোখে সুরমা লাগানো। পায়ে নূপুর। যেন স্বর্গের কোনো উর্বশী মোহিনী বেশে হাজির হয়েছে। একটা হাল্‌কা পারফিউমের গন্ধ নাকে আসছে। এরপর ওই মহিলা একটা মদ আর সোডার বোতল এনে টেবিলে রাখলেন। একটা কাঁচের গ্লাসের মধ্যে করে মদ আর সোডা ঢাললেন। ট্রে থেকে দু-এক টুকরো বরফ কুঁচি তাতে ফেলে আস্তে আস্তে গ্লাসে চুমুক দিতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে একটা সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ঠোঁটে রেখে দেশলাই জ্বালিয়ে সেটি ধরালেন। তারপর চেয়ার থেকে উঠে একহাতে মদের গ্লাস অন্য হাতের আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে আনমনে হলের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। মাঝে মধ্যে গুনগুন করে দু-একটা গানের কলি গেয়ে উঠছেন। মনোজের চোখ কপালে উঠল। তবে কি এটা গেরস্থ বাড়ি নয়! কোন বাড়িতে ঢুকে পড়েছে সে! তার বুকের ভেতরটা টিপ্‌টিপ্ করতে শুরু করলো। মনোজ দেখল দেওয়ালে একটা আরশোলা স্থির হয়ে রয়েছে। আর একটা টিকটিকি এক পা এক পা করে সে দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এভাবে বেশ কিছু সময় কাটলো। হঠাৎ মনোজ একটা পুরুষ কণ্ঠ শুনলে। তাদের চাপাস্বরে সংলাপ তৎসহ হালকা হাসির রেশ কানে এল কাঠ হয়ে গেল। এবার তার ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা ভাবতে শুরু করলে। রাত ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। ঘরের দেওয়ালে ঘড়িটার থেকে টিক্ টিক্ শব্দ আসতে থাকে। এক একটা মিনিটকে একটা ঘণ্টা বলে মনে হচ্ছে। এই চাপ সে যেন আর নিতে পারছে না। দু'চোখের পাতা বুজে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা। দেখলে ওই সুন্দরী মহিলার শ্বেতশুভ্র হাত তার বুকের উপর স্থাপিত আর সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি হাসছে। ভয়ে মনোজ দু'চোখ মেলে তাকাল।

উফ্, কি দুঃস্বপ্ন! ধড়মড় করে সে উঠে বসল। গা দিয়ে ঘাম দিচ্ছে। এবার বোধহয় সে পাগল হয়ে যাবে। আর ঘুম এল না। এপাশ ওপাশ করে সারাটা রাত কাটল। একসময় মনে হলো আকাশে যেন ভোরের প্রথম আভা দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই ঘড়ঘড় শব্দ তুলে দিনের প্রথম ট্রামটা চলে গেল। দূরের কোনো মসজিদ থেকে ফজরের আজানের ক্ষীণ ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। মনোজ শুয়ে থাকা আর সমীচীন বোধ করল না। বিছানা থেকে উঠে সে সোজা বাথরুমে চলে গেল। জল দিয়ে বেশ করে হাত-পা-মুখ ধুলো। তারপর ঘরে এসে ভালো করে জামাপ্যান্ট পরে, দেরাজের ওপর থেকে ব্যাগটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। হলঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে কিছুক্ষণ চিন্তা করলে। তারপর কোনো একটা ঘরের বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে নাতিউচ্চ গলায় বললে, 'ম্যাডাম শুনছেন। আমি এবার চলে যাচ্ছি।' আরও পাঁচ-ছ বার ডাকার পর খুট্ করে একটা শব্দ হলো। মহিলা দরজা খুলে তার দিকে তাকিয়ে ঘুম জড়ানো গলায় বললে, 'ও আপনি চলে যাচ্ছেন। এত ভোরে গাড়িঘোড়া পাবেন কি?' মনোজ বলে, 'বাস নাহলে ট্যাক্সি ঠিক পেয়ে যাব। আর তাছাড়া বাড়ির লোকজন খুব দুশ্চিন্তায় আছেন, বুঝতেই পারছেন।' তখন মহিলা বলেন, 'আচ্ছা একটু বসুন চা করে দিচ্ছি।' মনোজ বলে, 'না না ব্যস্ত হবেন না। চায়ের প্রয়োজন নেই।' ভদ্রমহিলা বললেন, 'সেকি! সকালবেলা খালি পেটে বাড়ি থেকে বেরোবেন তা হয় না। একটু বসুন তাড়াতাড়ি চা করে দিচ্ছি।' এই বলে ওই মহিলা বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে দ্রুতপায়ে রান্নাঘরের দিকে গেলেন। মনোজ দেখল গতরাতের কোনো চিহ্নই তার মধ্যে নেই, শুধু চোখে সুরমার একটা হালকা দাগ বোঝা যাচ্ছে। রান্নাঘর থেকে একটা ট্রেতে করে চা আর দুটো বিস্কুট আনতে আনতে মহিলা মনোজকে বলেন, 'কাল রাতে আপনার নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছে, অচেনা জায়গা ঘুমও বোধহয় ভালো করে হয়নি।' মনোজ বলে, 'সেকি কথা বলছেন, এইরকম একটা বিপদের মধ্যে আপনি আমায় আশ্রয় দিয়েছেন, এত যত্ন করলেন। আমার কোনো অসুবিধা হয়নি। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।' মনোজ কোনোরকমে দ্রুত বিস্কুট সহযোগে চা-টা গলাধঃকরণ করলে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে মহিলার দিকে হাতজোড় করে বলে, 'তাহলে আমি এখন আসি।' মহিলা মনোজের পিছন পিছন সিঁড়ি দিয়ে সদর দরজা পর্যন্ত এলেন।

মনোজ রাস্তায় নামল। ভদ্রমহিলা বললেন, 'সাবধানে যাবেন। ভালো থাকবেন।' মনোজ রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কিছুদূর এগিয়ে চলার পর পিছন ফিরে দেখে ওই মহিলা তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন মুখে মৃদু হাসি। রাত্রির সমস্ত কালিমা মুছে গিয়ে ভোরের সুর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। রাস্তার ধারে চায়ের দোকানের উনুনে আঁচ পড়েছে। কুলকুল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। একজন দুজন করে রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়েছে। বড়ো রাস্তায় এসে মনোজ দেখল একটা পাইকপাড়াগামী বাস এসে স্টপেজ থামল। দু-একজন লোক তাতে উঠল। মনোজ দৌড়ে গিয়ে বাসটায় উঠে পড়ে। বাসে উঠে মনোজ ভাবতে থাকে গতরাতের স্বপ্নের কথা। ওটা কি নিষিদ্ধপল্লীর কোনো বাড়ি ছিল? কিন্তু তার তো কোনো বিপদআপদ হয়নি। বরং সে পরম যত্নে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। কোনো হিসেবই সে মেলাতে পারল না। ■

আদর্শ মা

এটি সত্য ঘটনা। কোনো এক হিন্দু গ্রামে কেবল এক ঘর মুসলমান বাস করত। গ্রামের সবাই তাকে খুব ভালোবাসত। সেও হিন্দুদের সবকিছুকে শ্রদ্ধা করত। মুসলমান হলেও হিন্দুরা তাকে সমদৃষ্টিতেই দেখত।

তার স্ত্রী সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা গেল। বেচারা খুব কষ্টে পড়ল। একে তো স্ত্রী মারা যাওয়ার দুঃখ, তার উপর সদ্যোজাত শিশুটির লালনপালনের চিন্তা। তার পাশের বাড়িতে একঘর গোয়ালা বাস করত। তার ঘরেও দু'চার দিন হলো একটি শিশুর জন্ম হয়েছে।

গোয়ালার স্ত্রী ওই মুসলমানের দুঃখের কথা শুনে তার স্বামীকে বলল— বাচ্চাটিকে আমার কাছে এনে দাও। না হলে তো শিশুটি না খেতে পেয়ে মারা যাবে। আমি ওকে পালন করব।' গোয়ালা ওই মুসলমান ভদ্রলোককে বলে তার শিশুটিকে ঘরে এনে তার স্ত্রীকে দিল। গোয়ালার স্ত্রী দুটি শিশুকেই আপন শিশুর মতো লালনপালন করতে লাগল। দুটিকেই বুকের দুধ পান করাতো। তার মনে এই ভাবই এল না যে এটি পরের ছেলে।

ধীরে ধীরে দুটি ছেলেই বড়ো হয় উঠলো। লেখাপড়ার বয়স হলে গোয়ালা স্ত্রী তার স্বামীকে বলল— ছেলেটি বড়ো হয়েছে, এবার ওর বাবার হাতে ওকে দিয়ে এস। গোয়ালা তখন মুসলমান ভদ্রলোকটিকে ডেকে বলল– এখন তোমার ছেলে বড়ো হয়েছে। ছেলেকে তুমি নিয়ে যাও। তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মনের মতো মানুষ করে তোল। মুসলমান ভদ্রলোক তার ছেলেটিকে নিয়ে এসে লেখাপড়া শেখানার জন্য দূরে কোথাও চলে গেল।

পড়াশোনা শিখে ছেলেটি বড়ো হয়ে এক হাসপাতালে কম্পাউন্ডারের চাকরি পেল। একজন ভালো কর্মচারী হিসেবে তার খুব নাম ছড়িয়ে পড়ল। দৈবক্রমে ওই গোয়ালার স্ত্রীর একবার খুব বড়ো অসুখ হলো। চিকিৎসার জন্য তাকে ওই হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। ডাক্তার রোগিণীকে পরীক্ষা করে জানালেন একে এখনই রক্ত দিতে হবে, নইলে বাঁচানো যাবে না। রক্ত দিলেই সুস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু রক্ত

কে দেবে! কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি এগিয়ে এলেন। কারো রক্ত মিলল না। শেষে ওই মুসলমান কম্পাউন্ডার ছেলেটি এগিয়ে এল। তার রক্ত রোগিণীর রক্তের সঙ্গে মিলে গেল।

গোয়ালিনী মা অচেতন থাকায় কিছুই জানতে পারলো না। কিন্তু ছেলেটি চিনতে পারলো যে এই তার পালিতা মা। যে বুকের দুধ খাইয়ে তাকে শিশুকালে বাঁচিয়েছে। সে বুঝতে পারলো শিশুকালে এই মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার ফলেই তার রক্ত পালিতা মায়ের রক্তের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। ছেলেটিকে বলা হলো তুমি রক্ত দিতে পারবে? ছেলেটি বলল, আমি রক্ত দিতে পারি কিন্তু দুশো টাকা দিতে হবে। গোয়ালা তাকে দুশো টাকা দিলে ছেলেটি প্রয়োজন মতো রক্ত দিল। গোয়ালিনী তারপর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল এবং একদিন হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে বাড়ি চলে গেল।

কিছুদিন পর ছেলেটি গোয়ালার বাড়ি এসে দু'হাজার টাকা মায়ের পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে বলল –'তুমি আমার মা। আমি তোমারই ছেলে। শিশুকালে তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। এই টাকা তুমি রাখ।' গোয়ালিনী মা টাকা নিতে অস্বীকার করলে ছেলেটি হাসপাতালের সব কথা জানিয়ে বলল, 'রক্ত দেবার সময় আমি দুশো টাকা নিয়েছিলাম এই কারণে যে, বিনা পয়সায় তোমরা রক্ত নিতে চাইবে না আর রক্ত না নিলে তোমাকে বাঁচানোও যেত না। আমার রক্ত তো আসলে তোমারই রক্ত মা। তোমার দুধে আমি মানুষ হয়েছি। আমার সব কিছুই তোমার। তোমার বুকের দুধ পান করে তোমরা যাকে নিষিদ্ধ বলো সেরকম খাবার খেতে পারি না।' গোয়ালিনী মা খুব শুদ্ধাচারী মহিলা ছিলেন। তার দুধের প্রভাব ছেলেটি এত শুদ্ধ ও পবিত্র হয়েছে। আনন্দে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে তিনি আশীর্বাদ করতে লাগলেন। ছেলেটিরও চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

জগতের মায়েরা সবাই নিজ নিজ সন্তানকে লালনপালন করে বড়ো করে তোলে। কিন্তু এরকম কথা আজকাল বড়ো শোনা যায় না। বরং উলটোটাই শোনা যায়। শিক্ষিত ছেলেরা তাদের মা-বাবাকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে। মনে হয়, আজকালকার মায়েরা ওই গোয়ালিনী মায়ের মতো নিঃস্বার্থ ভাবনায় সন্তান লালনপালন করতে পারছেন না। তাঁরা স্তন্যদানের সময় হয়তো ভাবছেন, সন্তান বড়ো হয়ে অনেক টাকা-পয়সা রোজগার করে তাকে খুব সুখে রাখবে। এরকম নানান স্বার্থচিন্তা ও দুষিত ভাবনা স্তন্যদুগ্ধের সঙ্গে তার সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত হচ্ছে। তার প্রকৃতিও সেভাবেই গড়ে উঠছে। এই সন্তানরা বড়ো হয়ে মা-বাবার দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নিজের সন্তানকে কুকুর-শুয়োররাও তো পালন করে, সেটা বড়ো কথা নয়।

শম্ভুনাথ পাঠক

ভারতের পথে পথে

পুত্তাপূর্তি

অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলার অখ্যাত গ্রাম পুত্তাপূর্তি আজ ভারত তথা বিশ্বের কাছে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। ১৯২৬ সালের ২৩ নভেম্বর শ্রীসত্যনারায়ণ রাজুর জন্ম পুত্তাপূর্তিতে। ১৮ বছর বয়সে নিজেই ঘোষণা করেন সির্ধির সাইবাবার অবতার রূপে তাঁর আবির্ভাব। নানান অলৌকিকত্ব প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের বাণী শোনালেন শ্রীসত্য সাইবাবা। দুইয়ের আকর্ষণে ভক্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বর্তমানে তাঁর ভক্তের সংখ্যা দশ লক্ষের বেশি। ১৯৫০ সালে প্রশান্তি নিলয়ম্ নামে বিশাল আশ্রম হয়েছে। হয়েছে প্রশান্তি মন্দির, গণেশ মন্দির, বরলক্ষ্মীমাতার মন্দির, সুব্রহ্মণ্য মন্দির, গায়ত্রী মন্দির, শিব মন্দির, সর্বধর্ম স্তূপ, মেডিটেশন ট্রি, স্পিরিচুয়াল মিউজিয়াম প্রভৃতি। আশ্রমের ব্যবস্থাপনায় গড়ে উঠেছে স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল। আশ্রমের থেকে সবেতেই বিনা পয়সায় পরিষেবা মেলে।

জানো কি?

- দেশে সর্বনিম্ন জনসংখ্যার জেলা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর ।
- পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ন্যূনতম বয়স ২১ বছর।
- দেশের সেরা পঞ্চাতের তকমা পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গের দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত।
- কেরল রাজ্য সরকার কাঁঠালকে সরকারি ফল হিসেবে ঘোষণা করেছে।
- জিমকরবেট ন্যাশনাল পার্ক উত্তরাখণ্ড রাজ্যে অবস্থিত।
- কাঁচ কাটতে হিরের প্রয়োজন হয়।

ভালো কথা

সাফাইয়ের আনন্দ

আমাদের গ্রামের চারটি পাড়ার একটিই বাঁধ। বিশাল বড়ো বাঁধ। চৈত্র-বৈশাখ মাসে যখন চারিদিকের জল শুকিয়ে যায়, নলকূপে জল ওঠে না, তখন ওই বাঁধটিই চারটি পাড়ার মানুষের স্নানকরা, কাপড়কাচা, বাসনধোয়া, গোরু-মোষের জল খাওয়া ও শাকসবজিতে জল দেওয়ার একমাত্র সম্বল হয়ে ওঠে। গত অঘ্রানমাসে সনুর দিদির বিয়ের খাওয়া-দাওয়ার থার্মোকলের প্লেট, ফুল, আবর্জনা সব বাঁধের জলে ওরা ফেলে দিয়েছে। দু'মাসের মধ্যে জল সবুজ হয়ে পোকা হয়ে গেছে। গত রবিবারে আমরা বন্ধুরা মিলে বাঁধটি পরিষ্কার করেছি। দু'ঘণ্টা সময় লেগেছে। সনুর বাবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। পরে বলল, আমাদের খুব ভুল হয়ে গেছে। আমি চুন কিনে এনে জলে ঢেলে দেব। জল পরিষ্কার হয়ে যাবে। বড়োরা আমাদের খুব প্রশংসা করেছে। এটা করতে পেরে আমরাও খুব আনন্দ পেয়েছি।

সুজন মহান্তি, একাদশ শ্রেণী, গোবিন্দপুর, মানবাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

এযুগের অসুর

মৌনব দাস, অষ্টম শ্রেণী, টিপি রোড। কলকাতা-৬

রাস্তাঘাটে আবর্জনায়
নোংরা করছি দেশ
বলেল পরে বন্ধুরা বলে
করছি মোরা বেশ।
পথেঘাটে কত মানুষ
পায় না রোজ খাবার
তবু আমরা ফেলে দিচ্ছি
কত লোকের আহার।

কলকারখানার ধোঁয়া আছে
আছে ধুলোবালি
তারপরেতে গাছ কেটে
করে ফেলছি সব খালি।
মানুষ হয়েও ভুলে গেছি
হয়েছি বড়ো নিষ্ঠুর,
পৃথিবীকে ধ্বংস করতে
আমরা এযুগেরই অসুর।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা ।। পরীক্ষিৎ ।। ৭ ।।

অ্যান্ডি মারের অকাল অবসর

নিঃস্ব হলো বিশ্ব টেনিস

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

কী এমন বয়স হয়েছিল ব্রিটিশ টেনিস রাজপুত্রের। মাত্র বত্রিশ। আরও কত গ্রান্ডস্লাম জেতার কথা ছিল অ্যান্ডি মারের। নিজেকে এবং ব্রিটিশ টেনিসকে এক অন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করার সব সম্ভাবনাই ছিল। কিন্তু গত দেড় বছর ধরে কোমরের চোটের চিকিৎসা করিয়েও সেরকম ভালো ফল না হওয়ায় নতুন বছরের শুরুতেই জানিয়ে দিলেন অনেক হয়েছে আর নয়। কোর্ট থেকে ছুটির ঘণ্টা বেজে যাওয়ার সময় হয়েছে। এখন চলছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন বছরের প্রথম গ্র্যান্ডস্লাম টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্টে প্রথম রাউন্ডেই ছিটকে যান মারে অবাছাই, অনামী এক খেলোয়াড়ের কাছে হেরে। লকার রুমে ফিরে কান্নাভেজা চোখে সাংবাদিকদের বলেন 'বেশ বুঝতে পারছি আমি সময়ের বিপরীত দিকে ছুটে চলেছি। অলীক মরীচিকার মতো মনে হচ্ছে টেনিস দুনিয়াকে। মনে হয় বিশ্ব টেনিস ও টেনিসপ্রিয় ব্রিটিশদের আর কিছু দেওয়ার নেই। তাই নিজের দেশে যখন উইমবলডন চলবে, তখনই কোর্ট থেকে সরে দাঁড়াব।'

বহু বছর পর ব্রিটেনবাসী মারেকে পেয়ে স্বপ্নের ঘোরে ছিলেন। সেই কবে গত শতাব্দীর তিরিশের দশকে জনৈক ফ্রেড মেরি টেনিস বিশ্বে উঁচু করে তুলে ধরেছিলেন ইউনিয়ন জ্যাককে। পরপর তিন বার রাজকীয় মর্যাদার অল ইংল্যান্ড বা উইমবলডন ট্রফি জিতে কীর্তিধন্য করেছিলেন ইংরেজ গরিমাকে। তারপর শুধুই প্রতীক্ষা। অধরা মাধুরির খোঁজে ছুটে গেছেন একের পর এক ব্রিটিশ তারকা। যদিও মহিলা বিভাগে ভার্জিনিয়াওয়েড ১৯৭৭ সালে উইমবলডন জিতেছিলেন। কিন্তু কোনো পুরুষ খেলোয়াড়ের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি। টিম জেনম্যান, জন লয়েড, গ্রেপ রুডেস্কির মতো বড়মাপের খেলোয়াড়ও কোনও গ্র্যান্ডস্লাম ট্রফি মাথার ওপর তুলে ধরতে পারেননি। এরা প্রত্যেকেই সেমিফাইনাল পর্যন্ত উঠেছেন অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আয়োজিত গ্র্যান্ডস্লামে। শেষ পর্যন্ত সব রেজাল্ট ভেঙে নতুন নজির গড়তে পারলেন স্কটিশ পুরুষটি।

ব্রিটিশ যুবরাজ উইলিয়ামের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অ্যান্ডি মারে সব অর্থেই এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। স্কুলজীবনে যেমন ছিলেন শান্তশিষ্ট, সুভদ্র এক পড়ুয়া, টেনিস কোর্টেও তেমন ভদ্রতা, সৌজন্যবোধের প্রতিমূর্তি। বিশ্বের প্রতিটি বড়ো শহরে যেসব এটিপি টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় কিংবা চার প্রধান দেশে চারটি গ্র্যান্ডস্লাম, সব জায়গাতেই দর্শকদের নয়নের মণি হয়ে বিরাজ করেন অ্যান্ডি মারে। সংগঠক থেকে টুর্নামেন্ট অফিসিয়াল, মিডিয়া থেকে দর্শক প্রত্যেকেই ব্যথিত তাঁর অকাল অবসরে। টেনিস শৈলী তেমন দেখনদারি না হলেও অসম্ভব কার্যকরী এবং প্রয়োগ নৈপুণ্য ভরপুর এক সত্তা। তাই ২০১২ ও ২০১৬-র উইমবলডন, ২০১৩-র যুক্তরাষ্ট্র ওপেন ও ২০১৪-র অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জেতার পথে ফেডেরার, নাদাল জকোভিচের মতো মহাতারকা সহ অন্য সব রথী-মহারথীকে ভূপতিত করতে পেরেছিলেন। পরপর 'ব্যাক টু ব্যাক' 'গ্রেটেস্ট শো অ্যান্ড ফেসটিভ্যাল অন ইউনিভার্স'-এ উঠেছেন মারে এবং ব্রিটিশ জয়পতাকা। স্বভাবতই ব্রিটিশ রাজপরিবারের কাছের মানুষ অ্যান্ডি মারে হয়ে উঠলেন আপামর ব্রিটিশের নয়নের মণি। তাকে দেওয়া হলো 'অর্ডার অব ব্রিটিশ এম্পায়ার'।

স্যার অ্যান্ডি মারে এতই বিনয়ী ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন যে তার থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো তারকা হয়েও রজার ফেডেরার, রাফায়েল নাদালরা যে স্বীকৃতি পাননি, তা তিনি পেলেও কখনও জাহির করার চেষ্টা করেননি। তাই নিজেকে সর্বত্র অ্যান্ডি মারে হিসেবেই প্রতিস্থিত করেছেন। কয়েক বছর আগে ব্রিটেন যখন ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়, তার কাছাকাছি সময়ে স্কটল্যান্ড ও গ্রেট ব্রিটেনের থেকে বেরিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু করে। কিন্তু অ্যান্ডি মারে স্কটল্যান্ডের 'ফার্স্ট মিনিস্টার'-এর সঙ্গে দেখা করে বোঝান এই সিদ্ধান্ত হঠকারী ও কার্যকর হলে স্কটিশ জনতার সমস্যা অনেক বেড়ে যাবে। তাঁর কথা অমান্য করতে পারেননি স্কটিশ ক্যাবিনেট। ছোটো যুবরাজ প্রিন্স হ্যারির ওয়েডিং রিসেপশনে গিয়ে সেন্ট জর্জ চ্যাপেলে অসাধারণ অভিভাষণ দিয়েছিলেন অ্যান্ডি, যা শুনে দেশ-বিদেশ থেকে আগত অতিথি-অভ্যাগতরা বুঝে যান তাঁর প্রজ্ঞা বৈভব।

কোর্ট এবং সামাজিক জীবন দু'ক্ষেত্রেই অ্যান্ডি মারে এক স্থিত প্রজ্ঞা ও ঋদ্ধি নিয়ে বিচরণ করেন। যার জন্য স্থান-কাল-পাত্র সাপেক্ষ এক গ্রহণযোগ্য চরিত্র। অবশ্য টেনিস তারকা মাত্রেই আত্ম-সত্ত্ব-মনো- বুদ্ধির নিরিখে অন্য মাত্রা ও মানদণ্ডে উন্নীত। তার মধ্যেও অ্যান্ডি মারে ব্যতিক্রমী। কোনোরকম বিতর্কের অবকাশ নেই। চারিত্রিক মাধুর্য, আচার আচরণের মাধ্যমে গত দশ বছর ধরে ওয়ার্ল্ড ট্যুর সার্কিটে দেবদূত সুলভ ইমেজে গড়ে তুলেছেন। ২০১৭ সালে গ্রেট ব্রিটেনকে চমৎকার নেতৃত্ব দিয়ে বহু বছর পর বিশ্বকাপ বলে অভিহিত ডেভিস কাপে জয়যুক্ত করেন। স্পেন এবং ফ্রান্সের একচেটিয়া দাপটকে অতিক্রম করে ব্রিটেন আবার বিশ্ব টেনিসের দলগতবৃত্তে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। একসময়ে ডেভিস কাপে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের ছিল প্রশ্নাতীত দাপট। পরবর্তীকালে উঠে আসে সুইডেন, স্পেন, অর্জেন্টিনা ব্রাজিল, ইতালি সুইজারল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র— এই দশ-বারোটি দেশের দেশের মধ্যেই বেশিরভাগ সময়ে বাঁটোয়ারা হয়েছে ডেভিস কাপের ভাগ্য। তার মধ্যেও ব্রিটিশ আভিজাত্যকে পূর্ণ উদ্যমে উজ্জ্বলতর করে তুলেছেন অ্যান্ডি মারে। ▌

অভিষেক পল্লব : মাওবাদের বিরুদ্ধে এক অভিনব যুদ্ধে শামিল

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পুলিশ সুপার যদি পাশ করা ডাক্তার হন তাহলে সমীকরণটা একটু বিস্ময়কর মনে হয়। কিন্তু ডাঃ অভিষেক পল্লবের সঙ্গে পরিচয় হবার পর বোঝা যায় যিনি রাঁধেন তিনি চুলও বাঁধেন। অর্থাৎ যিনি অটোমেটিক রিভলবার হাতে আততায়ীর পিছু নেন, সেই তিনি ডাক্তারিও করেন।

২০১৭ সালের মার্চ মাসের ঘটনা। বাস্তারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক পল্লবের নাম খবরের কাগজের শিরোনামে উঠে এসেছিল। কারণ সেবার তিনি পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে আহত এক মাওবাদী কম্যান্ডারকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর নিজের কথায় : 'হাতে সময় বেশি ছিল না। প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। একজন চিকিৎসক হয়ে আমি চুপ করে বসে থাকতে পারিনি।'

এরপর ২০১৮ সালের জানুয়ারি। সেবার পোহ্‌রু নামের এক কুখ্যাত মাওবাদী কম্যান্ডারকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এই পোহ্‌রুর মাথার দাম ছিল তিন লক্ষ টাকা। ডাঃ পল্লব পোহরুর অসুস্থ স্ত্রী

দান্তেওয়াড়ার একটি স্বাস্থ্য শিবিরে ডাঃ অভিষেক পল্লব।

এবং অপুষ্টিতে ভোগা বাচ্চাদের চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। পোহরুর স্ত্রীর টিবি হয়েছে বুঝে তিনি তাকে স্থানীয় জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে দেন।

ডাঃ পল্লব ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের ২০১২ ব্যাচের অফিসার। এখন তিনি মাওবাদী অধুষিত ছত্তিশগড়ের দন্তেওয়াড়ার পুলিশ সুপার। প্রশসনিক দায়িত্ব পালনের ফাঁকে তিনি ২০১৬ সালে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স থেকে মনোবিদ্যায় প্রশিক্ষণ নেন। উদ্দেশ্য, প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার মাধ্যমে মূলস্রোতের ভারতীয় সমাজের প্রতি জনজাতি যুবকদের ক্ষোভ প্রশমিত করা এবং দেশবিরোধী মাওবাদের গ্রাস থেকে তাদের মুক্ত করা। এই কাজে তাঁর যোগ্য সহধর্মিণীর ভূমিকা পালন করেন চিকিৎসক-স্ত্রী যশা পল্লবও।

অভিষেক বলেন, 'গত আড়াই বছরে আমরা ৭০-৮০টা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছি। সেই সঙ্গে বলব শতাধিক চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য শিবিরের কথা। আমরা শিবিরের আয়োজন করি এমন সব প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে চিকিৎসক পাওয়া যায় না, কোনও স্বাস্থ্য- পরিকাঠামো নেই, এমনকী মাওবাদীদের ভয়ে সাধারণ স্বাস্থ্যকর্মীরাও সেখানে যেতে চান না।' স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই প্রতিটি শিবিরে উপস্থিত থেকে চিকিৎসা করেন। ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দেন। এছাড়া জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষকে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে সচেতন করেন। অপুষ্টির হাত থেকে শিশু ও মহিলাদের বাঁচাতে কী ধরনের খাবার খেতে হবে— সেই সম্বন্ধেও একটা প্রাথমিক ধারণা গড়ে দেবার চেষ্টা করেন।

অভিষেক জানান, 'আমরা মূলত প্রাথমিক চিকিৎসা করি। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করা ওষুধ রোগীর প্রয়োজন অনুসারে দিই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, আমার স্ত্রী একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ। এই অঞ্চলে নানারকম চর্মরোগ এবং অ্যালার্জির প্রকোপ মারাত্মক। বিশেষ করে এখানকার আবাসিক স্কুলগুলিতে। ...দন্তেওয়াড়া জেলার জনসংখ্যা আড়াই লক্ষ। গত আড়াই বছরে আমরা এখানকার প্রায় ২৫,০০০ মানুষের চিকিৎসা করেছি। যার ফলে ইদানীং জনজাতি সম্প্রদায়ের বহু মানুষ নানা প্রয়োজনে আমাদের জেলা হেডকোয়ার্টারে আসছেন। স্বাস্থ্য শিবিরে আয়োজনের ফলে জনজাতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের আত্মিক যোগাযোগ যে বেড়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু যে কোনও ভালো কাজেই বাধা থাকে। কখনও কখনও সেই বাধা পাহাড়ের মতে দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রেও বাধা আছে। সব থেকে বড়ো বাধা স্থানীয় গ্রামবাসীদের ভয়। তাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন স্বাস্থ্য শিবিরে গিয়ে চিকিৎসা করলে মাওবাদীরা তাদের পুলিশের চর বলে মনে করবে। অভিষেক জানেন সত্যি সত্যি এরকম কিছু হলে তার ফল হবে সাংঘাতিক। তাই তাকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হয়। কীরকম ব্যবস্থা? প্রথমে তারা গ্রামের কোনও প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিকে বোঝান। তারপর সেই জনপ্রতিনিধি গ্রামের সাধারণ লোককে রাজি করান। অভিষেক বলেন, 'ভয় পেয়ে ভালো কাজ করা বন্ধ করে দিলে চলবে না। তাহলে এতগুলো মানুষ সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। যার সুযোগ নেবে মাওবাদীরা।'

সন্দেহ নেই মাওবাদের বিরুদ্ধে এক অভিনব যুদ্ধে শামিল হয়েছেন ডাঃ অভিষেক পল্লব এবং তাঁর স্ত্রী। প্রাণনাশের হুমকি শুনেছেন অনেকবার কিন্তু দমে যাননি। যথার্থ সৈনিকের মতোই অকুতোভয়ে এগিয়ে গেছেন। মাওবাদের বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক যুদ্ধের পাশাপাশি অভিষেকের এই যুদ্ধও জরুরি। প্রাতিষ্ঠানিক সেনা মাওবাদীদের গ্রাস থেকে দেশকে উদ্ধার করুক আর অভিষেক করুন মন জয়। কারণ মন জয় করে অভিমানীদের ফিরিয়ে আনতে না পারলে দেশ কখনও ঘর হবে না।

অসহিষ্ণুতার অজুহাত প্রচারের আলোয় থাকার এক ঘৃণ্য অভিপ্রায় মাত্র

রঞ্জন কুমার দে

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভেঙে পাকিস্তান গড়ে উঠে। পাকিস্তান আপাদমস্তক একটি ইসলামিক রাষ্ট্র হলেও ভারত জন্মলগ্ন থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ। তেমনি পড়শি দেশ নেপাল প্রায় ৮৫ শতাংশ হিন্দু বহুল দেশ সংবিধান সংশোধন করে ধর্মনিরপেক্ষ হয়েছে। এটাই তো হিন্দুত্বের উদারতা, সহিষ্ণুতার গভীরতা। অন্যদিকে ভারতের অন্যতম প্রতিবেশী বাংলাদেশ ভাষার ভিত্তিতে স্বাধীনতা লাভ করলেও ধর্মনিরপেক্ষতার খোলস ঝেড়ে ফেলে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কম হলেও মুসলমান সমাজের ভূমিকা ছিল। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান পাকিস্তান চাইলেও অনেকে ভিটেমাটির টানে ভারতেই থেকে যায়। ভারতমাতাও কোনোদিন তাদের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করেনি। রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে প্রধান বিচারপতি, নির্বাচন কমিশনার, জেলাশাসক প্রভৃতি ছোটো-বড়ো পদে মুসলমানরা প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন। বলিউড থেকে শুরু করে ক্রিকেট, সংগীত, রাজনীতি-সহ প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুসলমানরা প্রথম সারিতে রয়েছে। হিন্দুদের হৃদয় আকাশের ন্যায় বিশাল। তাই সংখ্যাগুরু হয়েও মুসলমানদের আধিপত্য সহজে মেনে নিয়েছে। ভারতবর্ষের পুণ্য ভূমিতে কয়েক শতাব্দী পূর্বেও বিদেশি আক্রমণকারীরা ভারতীয়ত্বে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। আজও পাকিস্তানি কলাকাররা রুজি, রুটি, নাগরিকত্বের জন্য ভারতে ছুটে আসছেন।

ভারতের মুসলমান সমাজের পিছিয়ে থাকার একমাত্র কারণ তাদের জনসংখ্যা বিস্ফোরণ। এর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে অশিক্ষা, শিশুশ্রম, দারিদ্র, সন্ত্রাসবাদের মতো অভিশাপ। দুর্ভাগ্যবশত কোনো রাজনৈতিক দলই কখনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে জনসংখ্যা নিরোধে কোনো আহ্বানই রাখেনি। ভারত সরকার সংখ্যালঘু উন্নয়নকল্পে ২০০৬ সালে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গড়ে তোলে। বার্ষিক বাজেট ৪১৯৫.৪৮ কোটির এই মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। উল্লেখ্য, ভারত সরকারের 'শেখো ও কামাও' প্রকল্পের ৭৫ শতাংশ আসন সংখ্যালঘু যুব সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে, সেখানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৩০ শতাংশ সংখ্যালঘু মহিলার চাকরির সুবন্দবস্ত রয়েছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিল, জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন, মৌলানা আজাদ এডুকেশন কাউন্সিল প্রভৃতি সংখ্যালঘু উন্নয়নে যথেষ্ট কাজ করছে। ইন্দোনেশিয়ার পর সর্বাধিক মুসলিমবহুল দেশ ভারত এবং ভারতে তারা যথেষ্ট নিরাপদ।

প্রায় ১২৫ কোটি জনসংখ্যার দেশে কোথাও বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এই রকম বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও দেশের কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী হঠাৎ নির্দিষ্ট কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশকে অসহিষ্ণুতার চাদরে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করে। দেশে কাশ্মীরে হিন্দু নিধন, দিল্লিতে শিখ গণহত্যা, বড়োল্যান্ডে মুসলমানদের হত্যা, এছাড়াও দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ২০১৪-র পর নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় দেশের মুখোশধারী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনায় সরকারকে দায়ী করছে। ২০১৪-র আগে দেশে কোনো খারাপ ঘটনা ঘটেনি। উত্তরপ্রদেশের আখলাক হত্যায় এই ফেকু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পুরস্কার ফেরতের এক অঘোষিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ট্রেনের কামরায় বসার আসন নিয়ে ঝগড়ায় জুবেদ নামক এক যুবকের মৃত্যু ঘটে। অনাকাঙ্ক্ষিত এই ঘটনাটিকেও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার ঢাকঢোল পিটিয়ে

সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি করা হয়। উল্লেখ্য, কেরল, পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরায় প্রচুর বিজেপি-আর এস এস কর্মীদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু সবাই তখন স্পিকটি নট। দেশ থেকে প্রচুর নাম, যশ কামিয়েও অকৃতজ্ঞের মতো দেশকে অসহিষ্ণু বলার একটা ট্রেন্ড শুরু হয়ে গিয়েছে।

হামিদ আনসারি সংবিধানের বিভিন্ন উচ্চস্তরীয় প্রশাসনিক পদে আসীন হওয়া ছাড়াও দশ বছর উপ-রাষ্ট্রপতির পদে ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ বিদায়ী অনুষ্ঠানে তাঁর মনে হলো দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। আমির খান যাকে ভারতের সবাই সুপারস্টারের সম্মান দিয়েছে, তিনি মন্তব্য করেন তাঁর স্ত্রী নাকি দেশে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। অথচ আমির খান টিভির এক অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করতে গিয়ে বলেন শিবলিঙ্গে দুধ ঢালা শুধুই অপচয়, অবশ্য হজে যেতে তাঁর কোনো দ্বিধা হয়নি। এখন সংবাদ শিরোনামে নাসিরুদ্দিন শাহ। নাসিরের ভয় হয় কোনো ভিড় যদি তাঁর সন্তানদের ঘিরে তাদের ধর্ম জিজ্ঞেস করে। নাসির বুলন্দ শহরের এক পুলিশ ইন্সপেক্টরের মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে মন্তব্যটি করেন। অথচ সন্ত্রাসবাদী ইয়াকুব মেমনের ফাঁসি রদের আবেদনে স্বাক্ষর করতে তাঁর কোনো ভয় হয়নি। এ ছাড়াও ১৯৮৪ সালের দাঙ্গাতে, ১৯৯২-এর মুম্বই বিস্ফোরণ এবং ২৬/১১-র হামলায়ও তাঁর মনে কোনো ভয় আসেনি; তাই হয়তো কংগ্রেস এইবার নাসিরের পাশে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য রাষ্ট্রীয় অল্পসংখ্যক আয়োগ স্পষ্ট নাসিরের মন্তব্যে অসহমত প্রকাশ করেছে। নাসিরুদ্দিনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যে উৎসাহিত হয় পাকিস্তান।

কিন্তু সত্যিটা ভিন্ন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্ট্র্যাটেজিক ফোরসাইটের রিপোর্ট অনুসারে মানবতার জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশ হিসেবে পাকিস্তানকে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কুখ্যাত ব্লাসফেমি আইনে ১৯৯০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৬৫ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘুকে পাকিস্তানে হত্যা করা হয়েছে। পাকিস্তানের সংসদে দাঁড়িয়ে একজন হিন্দু সাংসদ লালচন্দ মালহী আক্ষেপের সুরে বলেন তাঁর কিছু মুসলমান সাংসদ বন্ধু তাঁকে 'গোরুর পূজারি', 'হিন্দু হিন্দু' বলে বিদ্রূপ করেন। পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের অপহরণ, ধর্ষণ এবং ধর্মান্তরকরণ নিত্যদিনের ঘটনা। ১৬ বছরের ববিতা মেঘারকে অপহরণ। ধর্মান্তকরণের পর নাম হয় গুলজানশাহ। ২০১২ সালে রিঙ্কল কুমারী নামের একটি মেয়ের সঙ্গেও এরকম বর্বরতা হয়েছিল। এখন ব্লাসফেমি আইনে আসিয়া নামে একটি খ্রিস্টান মেয়েকে হুমকি দেওয়া চলছে। পাকিস্তানের পাঠ্যপুস্তকে হিন্দুদের কাফের এবং ভারতকে প্রধান শত্রু দেশ হিসাবে শেখানো হয়। তাদের সংবিধানে সংখ্যালঘুরা প্রশাসনিক উচ্চ পর্যায়ের কোনো পদে আসীন হতে পারেন না। পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় সংগীত রচয়িতা ছিলেন জগন্নাথ আজাদ, কিন্তু ১৯৫০ সনে পাক সরকার সংগীত রচয়িতা হিন্দু হওয়ার দোষে জাতীয় সংগীত 'তারানা-এ পাকিস্তান'-এর বদলে 'কৌমি তারানা'কে মর্যাদা দেয়। যোগেন মণ্ডল যিনি পাকিস্তানের প্রথম আইনমন্ত্রী ছিলেন মৌলবাদীদের রক্তচক্ষুর ভয়ে অবশেষে ভারতের মাটিতে ঠাঁই নিতে বাধ্য হন। ভারত যদি এতই অসহিষ্ণু হবে তবে আদনান সামি, আতিক আসলামরা কেন ভারতে ছুটে আসছেন?

উল্লেখ্য, আচার-আচরণ, বেশ-ভূষায় জিন্না কখনো মুসলমান ছিলেন না। তাঁর পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন। তাঁর দাদুর নাম ছিল প্রেমজী ভাই মেঘজী ঠক্কর। তাঁরা বর্ণহিন্দু লোহানা'র বংশধর। প্রেমজীদের মৎস্য ব্যবসা থাকায় তাদের জাতিগত বহিষ্কার করা হয়। প্রেমজী পুরো জীবন ধর্মকে আঁকড়ে থাকলেও তাঁর একপুত্র পুঞ্জালাল ঠক্কর অপমানে স্ত্রী-পুত্র সহ ইসলাম গ্রহণ করে করাচিতে চলে যান। জিন্না এই পুঞ্জালালেরই পুত্র (সূত্র : জিন্নাহ, পাকিস্তান অ্যান্ড ইসলামিক আইডেন্টিটি— আকবর এস আহমেদ)। যাই হোক, জিন্না শুধু রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষায় মুসলিম কার্ড খেলেছিলেন। তিনি কখনো মনেপ্রাণে হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না। তাই তিনি মৃত্যুর ১১ মাস আগে সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'আপনি (পাকিস্তানের নাগরিক) স্বাধীন। মন্দিরে যেতে স্বাধীন, আপনি মসজিদেও যেতে স্বাধীন। পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রার্থনা, পূজাপাঠের যে কোনো জায়গায় আপনি যেতে স্বাধীন। আপনি যে কোনো ধর্ম-জাতি-বিশ্বাসের হতে পারেন, রাষ্ট্রের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।" উল্লেখ্য পাকিস্তানের পতাকার সাদা অংশটি নাকি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতীক। কিন্তু জিন্নার মৃত্যুর ছ'মাস পরেই পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান সংসদে 'Objectives Resolution' পেশ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করেন। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান ধর্মীয় স্বৈরতান্ত্রিক সংবিধান প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে ২৩ শতাংশ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের আজ মাত্র চার শতাংশ বসবাস (১.৮৫ শতাংশ হিন্দু) করে। জিন্নাহ হয়তো পাকিস্তানের এই ভবিষ্যৎ ছবি অনুভব করতে পেরেছিলেন তাই তিনি লিয়াকত আলির কাছে স্বীকার করে গিয়েছিলেন পাকিস্তান বানানো তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড়ো ভুল। তাই ইমরান খানের কোনো মন্তব্যের পূর্বে নিজের পাকিস্তান সম্পর্কে অবগত হওয়া আরও বেশি জরুরি। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় পাকিস্তান থেকে অধিকতর সুখে আছে, পাকিস্তানকে বরং চীনের দিকে লক্ষ্য দেওয়া জরুরি। কারণ সেখানে চীনা প্রশাসন মুসলমান সম্প্রদায়ের নামাজ, রোজা, বোরখা নিষিদ্ধ করে ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব করেছে। ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতা কখনো বিপন্ন নয়। নাসিরুদ্দিন শাহদের 'অসহিষ্ণুতা'র বার্তা নিজেদের শুধুই প্রচারের আলোতে থাকার এক ঘৃণ্য অভিপ্রায় মাত্র। ■

মালদা নগরের পুড়াটুলি শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক বিশিষ্ট আইনজীবী অমলেন্দু ভাদুড়ী গত ২৩ ডিসেম্বর পরলোকগমন

করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। এক সময় তিনি ভারতীয় জনসঙ্ঘের মালদা জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। তিনি ২ পুত্র, নাতি-নাতনি এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন।

* * *

মালদা জেলার গৌড়খণ্ডের কাঞ্চনতার রাত্রি শাখার স্বয়ংসেবক সমুন দাস ও সুমন

সিংহ গত ১৮ ডিসেম্বর পথদুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। দুজনেই মোটরবাইকে মালদা শহর থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সাহাপুর সেতু মোড়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তাঁরা। উল্লেখ্য, সুমন সিংহ তাঁর বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান। এই ঘটনায় গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে।

* * *

পূর্ব বর্ধমান জেলার স্বস্তিকা পত্রিকার প্রতিনিধি রামকানু দাস বৈরাগীর পিতৃদেব সুভাষচন্দ্র বৈরাগী গত ১২ ডিসেম্বর রাজুর গ্রামের বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও

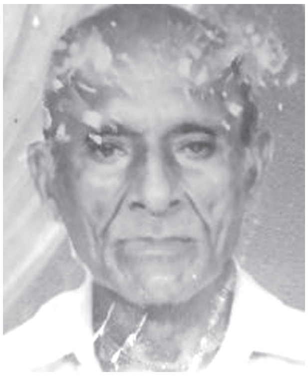

নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি স্বস্তিকার একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন।

* * *

হাওড়া জেলার বাউরিয়া শাখার স্বয়ংসেবক রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জির মাতৃদেবী

ইলা ব্যানার্জি গত ৭ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। রেখে গেছেন একমাত্র পুত্রকে।

* * *

দক্ষিণদিনাজপুর গোপালপুর শাখার স্বয়ংসেবক অজয় মাহাত গত ১২ জানুয়ারি

পরলোকগমন করেন। কয়েক বছর যাবৎ তিনি ব্রেনটিউমার ও অর্শরোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ২১ বছর। উল্লেখ্য, তার মা-বাবার একমাত্র সন্তান। তার একটা ছোট বোন রয়েছে।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাটোয়া জেলার ধাত্রীগ্রাম খণ্ড-কার্যবাহ শুভঙ্কর বসাকের পিতৃদেব অনিল বসাক গত ১৬ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

* * *

পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা নগরের স্বয়ংসেবক ও নগরব্যবস্থা প্রমুখ তথা

স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি পরিতোষ সাহা গত ১৮ জানুয়ারি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। তিনি ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনি-সহ বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি প্রথিতযশা আকুপ্রেশার চিকিৎসক ছিলেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তিনি স্বস্তিকা পত্রিকার গ্রাহক করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে সঙ্ঘ ও স্বস্তিকা পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ কলকাতার প্রণবানন্দনগরের পাটুলির প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতৃদেবী শ্রীমত্যা মহিলা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ১ কন্যা, ৩ পৌত্র, ১ পৌত্রী ও ১ প্রপৌত্রীকে রেখে গেছেন।

রামমন্দির নিয়ে অযথা টালবাহানা দুর্ভাগ্যজনক : অলোক কুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে রামমন্দির নিয়ে অযথা টালবাহানার তীব্র নিন্দা করেছে। পরিষদের কার্যনির্বাহী সভাপতি অলোক কুমারের স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তির বক্তব্য এইরকম : আদালত রামজন্মভূমি মামলার শুনানি আরও একবার পিছিয়ে দিল। আমরা আগেই অনুমান করেছিলাম বিরোধীপক্ষ নানারকম তুচ্ছ এবং অসার যুক্তির অবতারণা করে মামলার শুনানিতে বিঘ্ন ঘটাবে। দেখা যাচ্ছে, আমাদের অনুমানই শেষ পর্যন্ত সত্যি হলো। বিরোধীপক্ষের পাঁচজন বিচারপতিকে নিয়ে বেঞ্চ গঠনের দাবি একেবারেই অর্থহীন এবং নিয়মবিরুদ্ধ। কারণ, কতজন বিচারপতিকে নিয়ে বেঞ্চ গঠিত হবে তা নির্ধারণ করার অধিকারী একমাত্র প্রধান বিচারপতি। যৌথ বেঞ্চে বিচারপতি ইউ ইউ ললিতের অন্তর্ভুক্তির দাবিও একইরকম বেদনাদায়ক। কারণ, ট্রায়াল থেকে শুরু করে অ্যাপিল পর্যন্ত — রামজন্মভূমি মামলার কোনও পর্যায়েই বিচারপতি ললিতের কাজ করবার অভিজ্ঞতা নেই। ১৯৯৭ সালে আদালত অবমাননা মামলায় কল্যাণ সিংহের আইনজীবী হিসেবে তিনি লড়েছিলেন বটে, কিন্তু তার সঙ্গে রামজন্মভূমি মামলার কোনও সম্পর্ক নেই।

পরিস্থিতি বিচার করে বলা যেতে পারে, শুনানির দিন ১০ জানুয়ারি থেকে ২৯ জানুয়ারিতে পিছিয়ে দেওয়া যথেষ্টই দুর্ভাগ্যজনক। হিন্দুরা তাদের ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের কারণে সর্বত্র পরিচিত। কিন্তু রামজন্মভূমি মামলার শুনানিতে যাতে আর বিলম্ব না হয় সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বিচারব্যবস্থারও রয়েছে। দেশ আশা করে মাননীয় প্রধান বিচারপতি এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন এবং বিরোধীপক্ষের ঝুলিয়ে রাখার কৌশল কঠোর হাতে দমন করবেন।

আমরা লক্ষ্য করেছি, মুসলিম পারসোনাল ল' বোর্ড যৌথ বেঞ্চে মুসলমান বিচারপতি রাখার দাবি করেছে। যখন কোনও মামলার শুনানিতে ধর্মের ভিত্তিতে বিচারপতি নিয়োগের দাবি করা হয় তখন তা খুবই দুঃখজনক হয়ে ওঠে। এই মামলায় বিচারপতি নিয়োগের পদ্ধতিটি এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত। অদূর ভবিষ্যতে যেসব বিচারপতির সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁদেরই নিয়ে গঠিত হয়েছে এই মামলার সাংবিধানিক বেঞ্চ। এখন এই যুক্তিনিষ্ঠ প্রক্রিয়া বানচাল করে দেওয়ার যে-কোনও প্রয়াসের বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে।

নতুন নাগরিকত্ব আইন ৩১ হাজার শরণার্থীর সহায়ক হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান থেকে ভারতে আশ্রয় নেওয়া সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে ৩১ হাজার জন সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের আওতায় আসতে চলেছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে শরণার্থীদের গরিষ্ঠাংশই যে অসমে বসবাসকারী এই তথ্য বেঠিক বলে প্রমাণিত হচ্ছে। যে ৩১ হাজার শরণার্থীকে দীর্ঘমেয়াদি ভিসা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে অসমের শরণার্থী সংখ্যা মাত্র ১৮৭ জন। যাদের ২০১১ থেকে ২০১৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ভিসা দেওয়া হয়েছে।

যুগ্ম সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী শুধু পাকিস্তান বাংলাদেশ, আফগানিস্তান থেকে আগত শরণার্থীর মধ্যে ২৫,৪৪৭ জন হিন্দু, ৫৮০৭ জন শিখ, ৫৫ জন খ্রিস্টান, ২ জন বৌদ্ধ ও পার্শি রয়েছেন। এঁরা সকলেই দীর্ঘমেয়াদি ভিসায় অবস্থানকারী। ভারতে বসবাসে ইচ্ছুক পাকিস্তানিদের মধ্যে ১৫১০৭, ১৫৬০, ১৪৪৪, ৫৯৯ ৫৮১, ৩৪২ ও ১০১ জন যথাক্রমে রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, ছত্তিশগড় ও উত্তরপ্রদেশে বসবাস করছেন।

উল্লেখিত কমিটির কাছে দেওয়া তাদের রিপোর্টে ইনটেলিজেন্স ব্যুরো জানিয়েছে এই ব্যক্তিরা তাদের আবেদনপত্রে ধর্মীয় নির্যাতনের কারণেই দেশত্যাগের কথা নথিবদ্ধ করেছিলেন। নতুন আইনের সুবাদে এঁরাই ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। অন্যদিকে যাঁরা ভারতে পদার্পণের সময় নির্দিষ্টভাবে ধর্মীয় নির্যাতনের বিষয়টি উল্লেখ করেননি তাঁদের এখন নতুন করে তা করা সহজ হবে না। শুধু তাই নয়, নতুন যে কোনো আবেদনের ক্ষেত্রে গোয়েন্দা সংস্থা আর এ ডব্লু সবিস্তার তদন্ত করে দেখে তবেই নাগরিকত্বের সিদ্ধান্ত নেবে। এমনকী মুখপাত্রটি জানান পুরনো ৩১,৩১৩ জনের ক্ষেত্রেও নিরীক্ষণের প্রশ্ন রয়েছে। এর উদ্দেশ্য আবেদনকরীরা ভারতে অবস্থানকালীন সময়ে কোনো দেশবিরোধী বা বিপজ্জনক কাজকর্মে লিপ্ত কিনা সে বিষয়ে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত হওয়া।

সংবাদ প্রতিবেদন

মাল্য অবশ্যই নিখোঁজ রাজনৈতিক অপরাধী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত সরকার রাজনৈতিক মতলব নিয়ে বিজয় মাল্যর বিরুদ্ধে তদন্ত ও বিবিধ ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছে তা থেকে বাঁচতেই তাঁর ব্রিটেনে বসে থাকার যুক্তি উড়িয়ে দিলেন মুম্বইয়ের বিশেষ আদালতের বিচারক এম এস আজমি। সুনির্দিষ্টভাবে বিচারক জানিয়েছেন, 'মাল্য যেভাবে নিজেকে একজন আইন-অনুগত নাগরিক হিসেবে তুলে ধরার যুক্তি সাজিয়েছেন তা নিছকই তাঁর উর্বর কল্পনাপ্রসূত।' তাঁর ৫৫ পাতার রায়ে বিচারক বলেন সরকারের তরফে মাল্যকে 'নিখোঁজ অর্থনৈতিক অপরাধী' ঘোষণা করার পক্ষে যে তথ্য প্রমাণ দাখিল করা হয়েছে তা কখনই মাল্যর এমন আজগুবি অভিযোগের ভিত্তিতে বানচাল হতে পারে না।

প্রসঙ্গত গত ৫.১.১৯ তারিখে বিশেষ আদালত মাল্যর বিরুদ্ধে এই রায় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জানান তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিষয়টি আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি নিষ্পত্তি নিষ্পত্তি হবে। উল্লেখ্য, সদ্য পঞ্জিকৃত Fugitive economic offenders আইনের অধীনে এইটিই প্রথম রায় ঘোষিত হবে। মামলার সূত্রে মাল্যর আইনজীবীরা যুক্তি দেন যে মাল্য আদৌ গ্রেপ্তার এড়াতে বেআইনিভাবে বা তাড়াহুড়ো করে বা গোপনে দেশ ছেড়ে পালননি। তাঁর বিদেশে পূর্ব নির্ধারিত একটি মিটিং থাকার কারণেই তাঁকে দেশ ছাড়তে হয়। প্রত্যুত্তরে আদালত আইনজীবীদের যুক্তি নস্যাৎ করে দিয়ে বলেন যে মাল্য যদি যথার্থ আইন-অনুগত-নাগরিক হতেন সেক্ষেত্রে দেশ ছাড়ার সময়ই তিনি দেশে ফেরার পূর্ণ সূচনা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবগত করতেন। তা তিনি করেননি।

আদালতের তরফে উপর্যুপরি সমন ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হলেও মাল্য তাঁর ফেরার কোনো তারিখ জানাননি। ফলে তিনি কেবলমাত্র মিটিং করতে দেশ ছেড়ে দিলেন এমনটা ধরে নেওয়া নিরাপদ হবে না। আদালত তার চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণে জানায় ''মাল্যর সামগ্রিক আচার-আচরণ দেখে এটাই বোধা যায় যে ভারতে অপরাধমূলক মামলার মোকাবিলা এড়াতেই তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন''। উল্লেখ্য, গত বছর ডিসেম্বরেই ব্রিটিশ আদালত তাঁর মামলা খারিজ করে ভারতে প্রত্যার্পিত হওয়ার আদেশ দিয়েছে।

আমেদাবাদে অত্যাধুনিক হাসপাতালের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমেদাবাদে গত ১৮ জানুয়ারি অত্যাধুনিক সুপার স্পেশালিটি সরকারি হাসপাতাল— সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। আমেদাবাদ পুরনিগম নির্মিত ৭৮ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট এই হাসপাতালটিতে ১ হাজার ৫০০টি শয্যা-সহ আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও এয়ার অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী এই হাসপাতালের বিভিন্ন ইউনিট ঘুরে দেখেন। বিশ্বমানের হাসপাতাল নির্মাণে আমেদাবাদ পুরনিগমের ভূমিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন, 'আমেদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেশের অন্য সরকারি হাসপাতালগুলির কাছে আদর্শ বা মডেল হয়ে উঠবে।

৭৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ১৮ তলবিশিষ্ট এই হাসপাতালটিতে সুলভ মূল্যে বিশ্বমানের চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যাবে। আয়ুষ্মান ভারত কর্মসূচির সঙ্গে এই হাসপাতালটিকে যুক্ত করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত কর্মসূচির উল্লেখ করে বলেন, 'এই কর্মসূচির জন্যই ছোটো শহরগুলিতেও নতুন হাসপাতাল নির্মাণের চাহিদা বাড়ছে। দ্রুত নতুন হাসপাতাল গড়ে তোলা হচ্ছে, চিকিৎসক ও আধা-চিকিৎসক কর্মীর চাহিদা বাড়ছে এবং এর ফলে স্বাস্থ্য, পরিচর্যা ক্ষেত্রে যুবক-যুবতীদের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।'

তিনি আরও বলেন, বিগত চার বছরে দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের সুযোগ-সুবিধার ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়েছে। সেই সঙ্গে চিকিৎসা শিক্ষারও বিস্তার ঘটেছে এই উদ্যোগ সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার চাহিদা পূরণে ব্যাপক সাহায্য করছে।

গরিব মানুষের উদ্বেগ এবং তাদের কল্যাণে এই উদ্বেগগুলি দূরীকরণের বিষয়টি সর্বাগ্রে থাকে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সরকার সর্বদাই গরিব মানুষের পাশে রয়েছে। এদের স্বার্থেই স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিষেবার সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী জনঔষধী যোজনার মাধ্যমে কম দামে জেনেরিক ওষুধপত্রের সংস্থান করা হচ্ছে। এগুলি সবই সরকারের কল্যাণমূলক উদ্যোগের প্রতিফলন। সারা দেশে প্রায় ৫ হাজার প্রধানমন্ত্রী জনঔষধী কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানে সরকার অঙ্গিকারবদ্ধ এবং সাধারণ শ্রেণীভুক্ত দরিদ্র মানুষের স্বার্থে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ এই লক্ষ্যেই একটি পদক্ষেপ। সাধারণ শ্রেণীভুক্ত দরিদ্র মানুষের ১০ শতাংশ সংরক্ষণের লক্ষ্য পূরণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আসন সংখ্যা ১০ শতাংশ বাড়ানো হচ্ছে। সরকারি চাকরি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত দরিদ্র মানুষের স্বার্থে ১০ শতাংশ সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত রূপায়ণের যে পরিকল্পনা গুজরাট সরকার নিয়েছে, শ্রী মোদী তার প্রশংসা করেন। সংরক্ষণ বলবৎ করার ক্ষেত্রে গুজরাটই দেশের প্রথম রাজ্য হয়ে উঠেছে।

ভাঙন অবশ্যম্ভাবী, কর্ণাটকে মারামারি কংগ্রেসি বিধায়কদের

নিজস্ব সংবাদদাতা।। বেঙ্গালুরুর বিলাসবহুল রিসর্টে নিজেদের ভিতর মারামারি করলেন কর্ণাটকের কংগ্রেস বিধায়করা। এক বিধায়কের ছোঁড়া বোতলের আঘাতে মাথা ফেটে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হলেন আর এক কংগ্রেসি বিধায়ক। পুরো ঘটনাটিতেই এখন অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছে কংগ্রেস। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, কর্ণাটকে কংগ্রেসের বেশ কিছু বিধায়ক যে দল ছাড়তে তৈরি— এই ঘটনা সেটাই প্রমাণ করেছে। গত শুক্রবার বেঙ্গালুরুর বিলাসবহুল ঈগলটন রিসর্টে দলীয় ৮০জন বিধায়কের ভিতর ৭৬ জন বিধায়ককে নজরবন্দি করে রেখেছিল কংগ্রেস। কংগ্রেসের আশঙ্কা ছিল, বেশ কিছু বিক্ষুব্ধ দলীয় বিধায়ক দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিতে পারে। আর তা যদি হয়, তাহলে কর্ণাটকে জে ডি এস-কংগ্রেস জোটের মন্ত্রীসভার পতন অবশ্যম্ভাবী। সেই আশঙ্কা থেকেই কংগ্রেস তাদের ৭৬ বিধায়ককে এই বিলাসবহুল রিসর্টে নজরবন্দি করে রেখেছিল। তবে, এতেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি কংগ্রেস। গত রবিবার এই রিসর্টেই কংগ্রেসি বিধায়করা নিজেদের ভিতর মারামারি শুরু করে দেন। আনন্দ সিংহ নামে এক বিধায়ককে বোতল ছুঁড়ে মারেন জে. গণেশ নামে আর এক কংগ্রেস বিধায়ক। বোতলের আঘাতে গুরুতর জখম হয়ে আনন্দ সিংহ এখন অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি। তাকে দেখতে হাসপাতালে ছুটে যান কংগ্রেস নেতা শিবনাথ। দলীয় সমর্থকরাও হাসপাতালের সামনে ভিড় জমায়।

হাসপাতালে ভর্তি কংগ্রেস নেতা আনন্দ সিংহ

কংগ্রেস অবশ্য এই খবরটিকে চেপে যাওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। কংগ্রেস নেতা শিবকুমারের ভাই বিধায়ক ডিকে সুরেশ বলেছেন, আনন্দ সিংহ বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। যদিও কংগ্রেসের সাফাইয়ের আগেই বিভিন্ন সূত্র থেকে সত্য ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। বিজেপি বিধায়ক আর অশোক অভিযোগ করেছেন, শিবকুমার এবং সুরেশ রাজ্যবাসীকে বিভ্রান্ত করছেন। আনন্দ সিংহের শারীরিক অবস্থার কথা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে জানাক এবং পুলিশ এ নিয়ে একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করুক, এই দাবি তুলেছেন তিনি। বিজেপি তাদের টুইটারে কটাক্ষ করে লিখেছে, কংগ্রেস তাদের নিজেদের বিধায়কদের ভিতর মারামারি ঠেকাতেই ব্যর্থ।

দলের ভিতর বিক্ষোভ দিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই ঘোর সংকটে কংগ্রেস শিবির। সম্প্রতি কংগ্রেস পরিষদীয় দলের বৈঠকে ৪ বিধায়কের অনুপস্থিত থাকার ঘটনায় এই জল্পনা আরও বেড়েছে যে, কর্ণাটকে কংগ্রেসের ভাঙন অবশ্যম্ভাবী। সম্প্রতি নিজেদের ভিতর মারদাঙ্গা করে কংগ্রেসি বিধায়করা দলের ভাঙনকেই আরও ত্বরান্বিত করলেন।

মধ্যপ্রদেশে বিজেপি নেতা খুন, রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পরই বিজেপির নেতা এবং কর্মীদের ওপর রাজনৈতিক অত্যাচার বেড়ে গেছে। সম্প্রতি সেখানে দলের দুই নেতা প্রহ্লাদ বন্দোয়ার এবং মনোজ থ্যাকারে খুন হয়েছেন। রাজনৈতিক হত্যা এবং অনর্থক হয়রানির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে দল। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপির নেতা শিবরাজ সিংহ চৌহান কংগ্রেসের এই খুনোখুনির রাজনীতিকে কমলনাথের নেতৃত্বাধীন সরকার হালকা ভাবে নিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পরই যে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে সেকথাও শ্রী চৌহান সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস পরিবর্তনের কথা বলে ক্ষমতায় এসেছে। আমি জানতে চাই এই পরিবর্তনের কথাই কি তারা বলেছিল? ওরা আসার পরই খুনোখুনি শুরু হয়ে গেছে। মান্দসৌর এবং বারওয়ানিতে দুই বিজেপি নেতা খুন হয়েছেন। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এতটাই অবনতি হয়েছে যে খুনিরা প্রকাশ্যে দাপিয়ে বেড়ালেও কারও কিছু বলার নেই।' তিনি আরও বলেন, 'বিষয়টিকে সরকার হালকাভাবে নিচ্ছে। সব দেখে শুনে মনে হয় এর পিছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। আমি সিবিআই তদন্ত দাবি করছি। সেই সঙ্গে আমি সরকারকে সাবধান করে দিচ্ছি, যদি অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু বিজেপি রাস্তায় নামবে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিজেপি নেতা মনোজ থ্যাকারে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে আর ফেরেননি। ধানক্ষেতে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতদেহের পাশে একটি বড়ো পাথরের চাঁই পাওয়া গেছে। পুলিশের অনুমান ওই পাথর দিয়েই মনোজবাবুর মাথা থেঁৎলে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে প্রহ্লাদ বন্দোয়ার গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। তিনি ছিলেন মান্দাসৌর পুরসভার প্রেসিডেন্ট। এখনও পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েনি।

বাংলার বিজয়া

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

মিনার-বিজলি-ছবিঘরের মতো অভিজাত প্রেক্ষাগৃহ বহুদিন পর একটি আদ্যন্ত বাংলা ছবি প্রদর্শনের কৌলিন্য লাভ করেছে। ছবিটি ২০১৭ সালে চলচ্চিত্রের বহু বিভাগে সেরার শিরোপা জিতে নেওয়া কৌশিক গাঙ্গুলীর ‘বিসর্জনের’ প্রলম্বিত রূপ, এমন কথাই শোনা গেছে। বিসর্জনে ভারতের নাসির আলি বাংলাদেশে গিয়ে পদ্মা (জয়া এহেসান)-কে বিয়ে করেছিল। সে ছবিতে ঘটনাচক্রে সে মৃত এমনটাই অনুমিত হয়। পরিচালক জানিয়েছেন এই নাসের (আবির চ্যাটার্জি) ও পদ্মাকে নিয়ে দর্শকের ছিল নিরন্তর কৌতূহল। তারই পরবর্তী চলচ্চিত্রায়ণ ‘বিজয়া’। বিসর্জন শব্দের অনুষঙ্গেই বেদনা অন্তর্নিহিত থাকে কিন্তু বিজয়ার ক্ষেত্রে থাকে মিশ্র অনুভূতি। বিসর্জন ছিল বাংলাদেশের পটভূমিতে ঘাত প্রতিঘাতময় এক চলচ্চিত্র নির্মাণ। কৌশিকের ছবিতে আবেগ কখনও তাকে ছেড়ে যায় না। তাই সেখানে ছিল প্রেম বিরহ ক্রোধ ইত্যাদি মানসিক অবস্থার নিটোল চলচ্চিত্রায়ণ। সাম্প্রতিক বিজয়াতেও তার কোনো অভাব নেই। বরং তা আরও তীব্র, জটিল ও অন্তর্মুখী।

কাহিনির চলমানতায় দেখা যায় পদ্মা এখন বাংলাদেশের ক্ষমতাবান ব্যবসায়ী গণেশ মণ্ডলের স্ত্রী। তাদের একটি সন্তানও রয়েছে। গণেশ হার্টের কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা করাতে ভারতের কলকাতায় এসেছে। এখানেই নাটকীয়ভাবে নাসেরের (বাংলাদেশে যে ছিল সুভাষ) সঙ্গে শহরের হাসপাতালে দেখা হয় পদ্মার। শুরু হয় তীব্র মানসিক টানাপোড়েন। জয়ার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের স্রোত বেগবান হতে থাকে। আবির কিন্তু জয়ার প্রতি গভীর প্রেমাসক্ত। সেকথা সে জয়াকে অকপটে জানায়। এগুলি কাহিনির বা চিত্রনাট্যের নিছক রূপরেখা। কিন্তু চরিত্রগুলির অভ্যন্তরীণ আনন্দ বিষাদ লজ্জা ঈর্ষার যে ফলিত রূপ শিল্পীরা ছবির চলনের সঙ্গে তাদের অভিনয় সৌন্দর্যে উন্মোচন করেন তার একটি চূড়ান্ত সফল রূপ এই ‘বিজয়া’। শেষাংশে কৌশিকের সঙ্গে জয়ার অভিনয় বাংলাছবির সম্পদ। চলচ্চিত্র ইতিহাসে ‘কাহিনি চিত্রনাট্য পরিচালনা’ বহু বিশ্ববরেণ্য পরিচালকের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কিন্তু কৌশিকের অসামান্যতা একই সঙ্গে তার অভিনয়ে (প্রথম দিকের কাঙাল মালসাট স্মর্তব্য) চলচ্চিত্রের ঈশ্বরপ্রতিম চ্যাপলিন তা করে দেখিয়েছিলেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রে ঋত্বিক ঘটক ‘যুক্তি তক্কো গপ্পোয়’ সে চেষ্টা করলেও তা ছিল জীবনীমূলক। হিন্দিতে গুরুদত্ত ‘সাহেব বিবি গোলাম’-এর মতো কিছু সফল ছবি করলেও তাঁরা অভিনেতা কৌশিকের চৌহদ্দিতে প্রবেশাধিকার পাবেন না। ছবিতে গণেশ মণ্ডল নাসেরের বিধবাকে জোর খাটিয়েই বিয়ে করেছে। কিন্তু তার প্রেমে কোনো খাদ নেই। ছবিতে পদ্মা যখন আবিরের সঙ্গে সম্পর্কের জটিলতার কারণে চোখের জল ফেলছে কৌশিকের গণেশ তখন চলচ্চিত্র অভিনয়ের শীর্ষবিন্দু ছুঁয়ে বলেছেন ‘এমন চোখের জলের দুই একটা মুক্তার দানা আমি পাইলে...হায়রে’। ছবিতে সে ভিলেন না প্রেমিক না উদাসীন পুরুষ তা গণেশ কিছুতেই একমাত্রায় মাপতে দেয় না। শহরের উত্তরপ্রান্তের হাসপাতালে ডাক্তারকে (দুলাল লাহিড়ী) সে বলছে, ‘আমার কি হইসে তা জাননের অধিকার তো আমার আসে... কী বাঁচুম না বলেন ডাক্তার’? কৌশিকের চোখ দুটির দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা বক্র কিন্তু তার যে ব্যবহার তিনি করলেন তা বিরল। ঋত্বিক ঘটকের ওপার বাংলার মেয়ের ভূমিকায় শাওলি মিত্রকে আবহমান বাংলার প্রতিরূপ ‘বঙ্গ বালা’ বলেছিলেন। জয়া এহেসানের ‘পদ্মার’ মুখের ক্লোজ আপে, তাঁর চিবুকে সেই চিরায়ত বাংলার ছায়া ঢেউ তুলে যায়। নীচু পর্দার মার্জিত অভিব্যক্তির সহজ দক্ষতায় ও অসামান্য বাঙ্গালিসুলভ লাবণ্যে তিনি বাংলা চলচ্চিত্রে এক স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেলেন।

কলকাতার এক বিচিত্র মেসবাড়ির বাসিন্দাদের ও গণেশ মণ্ডলের ছায়াসঙ্গী লামার অভিনয়ও চমৎকার। ছবিতে গণেশ পদ্মার পুত্রকে নিয়ে চমক আছে। ডাক্তার জবাব দিয়ে দেওয়ার পর কাউকে কিছু না বলে সে বাংলাদেশে ফিরে গেছে। পদ্মা কিন্তু আবিরের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে চিরন্তন বাঙ্গালি নারীর মর্যাদায়। ছবিটি দেখা বৃথা যাবে না। ■

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

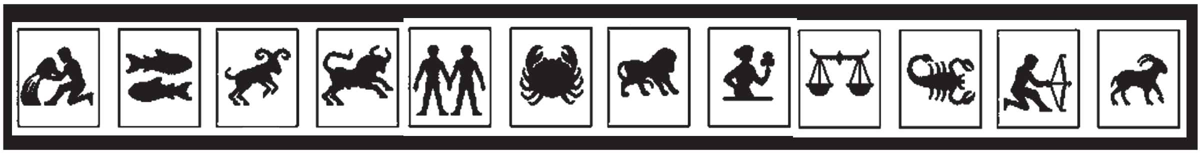

২৮ জানুয়ারি (সোমবার) থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে রাহু, বৃশ্চিকে বৃহস্পতি-শুক্র, ধনুতে শনি, মকরে রবি-বুধ-কেতু। মঙ্গলবার দুপুর ১২-৩৫ মিনিটে বৃশ্চিক থেকে শুক্রের ধনুতে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র তুলায় স্বাতী নক্ষত্র থেকে ধনুতে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে।

মেষ : দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, বিবেচক-পরিজন প্রিয়-অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবসায় উন্নতি, প্রবাস। মাতার স্বাস্থ্য বিষয়ক উদ্বেগ। কবি, লেখক, সাংবাদিক, অনুবাদকের অনুকূল দিশায় জীবনে প্রতিভার সাফল্য। ভ্রাতা-ভগ্নী ও স্বজন বাৎসল্যে ভরপুর মন। রমণীর অভিসন্ধির সম্যক উপলব্ধি ও নিজ ব্যক্তিত্বে উত্তীর্ণ।

বৃষ : গৃহ, বাহন-মিত্র, লোকপ্রিয়তা, বিদ্যা ও কর্মে উৎসাহ ও সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে নিজ দক্ষতায় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শংসা প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর গুপ্ত শত্রুতায় ব্যথিত। বিদ্যার্থীর মনঃসংযোগ, স্মরণশক্তি বুদ্ধিমত্তায় নতুন চিন্তাভাবনার উদ্ভাবক। কর্মপ্রার্থীর নিজ পছন্দের বিষয়ে কর্ম প্রাপ্তি। হঠাৎ নিকট ভ্রমণ ও কণ্ঠপীড়া।

মিথুন : শিল্প, সৌন্দর্য চিন্তার উদারতা, বিনয়, নম্রতা, মানব বেদনার প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও শিশুর সারল্যে ভরপুর মন। বিত্ত ও আভিজাত্য গৌরবে জীবনসঙ্গিনীর ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধি কৌশল সদর্থক। একাধিক উপায়ে অর্থ আয়ের সংস্থান ও হঠাৎ প্রাপ্তি যোগ। আত্মীয় কুটুম্ব, সুখাদ্য ভোজন ও বিলাসিতায় ব্যয়যোগ।

কর্কট : চিন্তার অস্বচ্ছতা, শারীরিক দুর্বলতা, মানসিক অতৃপ্তভাব। প্রশাসক, আইনজ্ঞ, সংগীত ও চিত্রশিল্পীর সম্মান ও সাফল্য। রহস্যজনক কাজে প্রবণতা বৃদ্ধি। পৈত্রিক ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে প্রাপ্তির ভাণ্ডার পূর্ণ। উচ্চপদস্থের বদান্যতায় পেশাগত উন্নতি ও আর্থিক আনুকূল্য। উচ্চশিক্ষায় প্রবাস, সামাজিকতায় দায়িত্ব বৃদ্ধি। শরীরের মধ্যাংশের অস্ত্রোপচার ও চক্ষুপীড়া।

সিংহ : স্বজন সম্পর্কে উন্নতি, শিল্প ও সৌন্দর্যের উপাসক। দৃঢ় প্রত্যয়ে বুদ্ধি ও কর্মের বহুমুখী প্রয়াস। বিত্ত ও অভিজাত্য গৌরব, খনিজ, পরিবহণ, প্রোমোটিং ও ইলেকট্রনিক্স ব্যবসায় লক্ষ্মীর কৃপা বর্ষণ। সন্তানের পড়াশুনায় পারিবারিক ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি। প্রেমিকের প্রণয়ী থেকে পত্নীতে বাস্তবায়ন।

কন্যা : ভক্তি, শ্রদ্ধা, সবলতা, সহনশীলতা, উদারতা, নম্রতায় বিকশিত অন্তর আনন্দময়তায় সুখী জীবন লাভ। শিষ্টাচার ও সৌজন্যে গুণীজন ও ভালো সুহৃদ সম্পর্ক। অপূরণীয় দীর্ঘ দিনের মনোবাঞ্ছা পূরণ। বেকারত্বের অবসান ও প্রতিযোগিতায় সাফল্য। শিক্ষার্থীর নতুন চিন্তাভাবনার উন্মেষ।

তুলা : অসৎ সংসর্গ ও জেদ ত্যাগ, অন্যথায় শিক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভে বাধা। বিলাস-ব্যসন ও রসনা তৃপ্তিতে ব্যয়। কর্মক্ষেত্রে বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলা শ্রেয়। পত্নীর পদোন্নতি। স্বর্ণালংকার, ওষুধ, বই, শৌখিন ব্যবসায় সুপ্রসন্ন ভাগ্য। প্রেমজ সংস্পর্শে সহনশীলতা প্রয়োজন। অগ্রজের পদোন্নতি।

বৃশ্চিক : কর্মে দায়িত্ব বৃদ্ধি ও আর্থিক সাফল্য। পিতা অথবা গুরুজন স্থানীয়ের পরামর্শ ব্যবসায় উন্নতির সহায়ক, নতুন কোনো পরিকল্পনার বাস্তবায়নের প্রভূত সম্ভাবনা, যুবক বন্ধুর পীড়াদায়ক ব্যবহার। জীবিকায় নতুন দিশা ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজে দয়ার্দ্রহৃদয়ের প্রকাশ। হৃদ্‌যন্ত্র ও রক্তচাপ বৃদ্ধি রোগীদের সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।

ধনু : জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধির সপ্রতিভতায় প্রতিভার বহুমুখী বিচ্ছুরণ ও আত্মীয়, প্রতিবেশী, স্বজনবাৎসল্য ও অন্ত্যজ শ্রেণীর সহায়তায় সফল মনস্কাম। অনুভবী, বিচারশীল, অধ্যয়নে রুচিবান ও শিল্পরসিক। একাধিক উপায়ে অর্থাগম হলেও যুবকবন্ধু হিতকারী নহে। পরিবারে সদস্য বৃদ্ধির যোগ। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর ব্যবহারে অসংগতি ও মনঃকষ্ট।

মকর : গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্রী উভয়েরই শরীরের বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতার ঘাটতি না থাকলেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আচরণ হতোদ্যমের কারণ। বিদ্যার্থীর আধুনিকতার পরশে জ্ঞানার্জনে মনঃসংযোগের অভাব। জটিল মনোভাবাপন্নদের এড়িয়ে চলুন। বাড়ি, গাড়ি কেনার পরিকল্পনায় সাবলীল ইতিবাচক পদক্ষেপ। সপ্তাহের শেষভাগে গুরুজনের স্বাস্থ্যাবনতির সম্ভাবনা।

কুম্ভ : পরিজন প্রিয়, বিদ্যা, কর্মে সাফল্য। সংবেদনশীলতায় অতি সুলভ ব্যবহার, সমবেদনায় প্রতিবেশীর সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, কর্মে বিশ্বস্ত সহকারী পরিবার ও সমাজে দরদি, ভাবসংগীত কলায় রসাস্বাদন ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ। রিসার্চ, প্রযুক্তিবিদ ও ফরেস্ট ইঞ্জিনিয়ারের বহুমুখী কর্মপ্রয়াস ও আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা।

মীন : চপলতা, মানসিক অস্থিরতা, অতৃপ্তভাব, কর্মপ্রকল্পে স্থবির অর্থাৎ আলোচ্য সপ্তাহে বাক্‌সংযমী, ধৈর্যশীল হওয়া ও বিতর্ক পরিবেশ এড়িয়ে চলা বাস্তবসম্মত। গৃহসংস্কারে ও গৃহশ্রী চিকিৎসায় ব্যয় যোগ। সপ্তাহের শেষ বহু প্রতীক্ষিত সাফল্য করার সম্ভাবনা। অর্থাৎ তমসা আঁধারে উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা

● জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।

—শ্রী আচার্য্য